গল্প - অভীক সরকার

গল্প

শোধ

অভীক সরকার

ফজরের নামাজ সেরেই বেরিয়ে পড়েছিলেন আহমেদ খান। ভোপালের নওয়াব ঘাউস মহম্মদ খানের ওয়াজির-এ-আজম মির্জা আজিজের বিশ্বস্ত সহচর আহমেদ খানের বয়েস আটচল্লিশ ও বাহান্নর মধ্যবর্তী ধূসর সীমারেখায়। ছোট অবস্থা থেকে নিজ চাতুর্যে বিলক্ষণ প্রভাবশালী হয়ে ওঠা আহমেদ খানের বিশাল দৃষ্টিনন্দন হাভেলি, ছোট কিন্তু টাইট হারেম, অগণিত দাসী এবং কিছু অল্পবয়সী দাস, বেশুমার শরাব আর লাখনউভি বাঈজি নাচের মেহফিল ভোপাল শহরের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিশেষ প্রসিদ্ধ। তার ওপর স্বয়ং ওয়াজির-এ-আজমের নৈকট্য ওঁর শান-ও-শওকতে যে চার চান্দ লাগিয়ে দিয়েছিল, এ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিপুল প্রতাপে উনি ক্ষুদ্র মন্ত্রীপ্রতিনিধিসম আধিপত্যে সময় কাটাচ্ছিলেন, এমন অসময়ে এ হুজ্জোত।

খোদ নওয়াবের আদেশ, অন্তত এক লক্ষ টিপুশাহী মোহর নিয়ে কম্পানির কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এবং চুপিচুপি, কাকপক্ষীতে যেন টেরটি না পায়।

কম্পানির গভর্নর বাহাদুর বেন্টিঙ্ক সাহেবের খাস পয়গাম নিয়ে পরশু এক ফিরঙ্গ এসেছিল বটে। নওয়াবের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কিছু আলোচনাও হয়, আর কারও থাকার হুকুম ছিল না, এক মির্জা আজিজ ছাড়া। তারপর গতকাল রাতে আহমেদ খানের হাভেলিতে হঠাৎ করে মির্জা আজিজের ডানহাত শওকত জঙ্গ এসে হাজির, ওয়াজির-এ-আজমের খাস এত্তেলা নিয়ে। আর তারপরেই এই হাঙ্গাম।

ঘোঁট কিছু একটা পাকছে বুঝতে পারছিলেন আহমেদ খান। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি এখন ভারতশাসক, দিকে দিকে আরও দৃঢ় হচ্ছে তাদের শাসন। দিল্লির মুঘল সালতানত তো না থাকারই মতন, সুলতান শাহ আলমের ছেলে আকবর শা নামেই ভারতসম্রাট, বস্তুত লালকিলা থেকে জুম্মা মাসজিদ, ব্যাস, এই পর্যন্তই ওঁর হুকুমত চলে। এই লালমুখো নাসারা ফিরঙ্গরাই এখন হিন্দুস্তানের বেতাজ সুলতান। শুধু তখত-এ-তাউস দিল্লির বদলে কলকাতায়, এই যা। তা এর মধ্যে নয় নয় করেও ভোপালের নওয়াবশাহী দেড়শো বছরের হলো প্রায়। তাকে আরও কয়েকশো বছর জিন্দা রাখতে গেলে নতুন শাহেনশাহদের খুশ করাটা বাধ্যতামূলক তো বটেই। আবার কথাটা সর্দার রণজিৎ সিং এর কানে ওঠাও চলবে না, শাহেনশাহ আকবর শাহের কানে তো নয়ই, হাজার হোক, মরা হাতিও লাখ টাকা বরাবর। আউধ আর মাইসোরের ক্ষেত্রে কম্পানির নাক গলানো দেখে অনেক রাজা নওয়াবেরই রাতের নিন্দ হারাম হয়ে গেছে। ফলে নতুন সুলতান বেন্টিঙ্ক বাহাদুরকে খুশ রাখতে হলে এই লুক্কাচ্ছুপি ছাড়া উপায় যে নেইই, আহমেদ খান সেটা ভালোই বোঝেন।

এখন নওয়াবের আদেশ, অমান্য করা আত্মহত্যার শামিল। তাছাড়া কাজও তো তেমন আহামরি কিছু নয়। সগরে কম্পানির অফিস আছে, সেখানে ম্যালোনি সাহেব আছেন, সেখান অবধি টাকা পৌঁছে দিয়েই ব্যাস, ঘরের ছেলে ঘরে। বাকিটা কম্পানিই না হয় বুঝে নেবে। ভোপাল থেকে সগর বেশী দূরে নয়, পচাস কোস মতন। এই যে আজ ফজরের পর রওয়ানা দিলেন, পা চালিয়ে গেলে এশার নামাজ রাহতোগড়ে আদায় করে ওখানেই রাত্রিবাস। আর পরের দিন জোহরের নামাজ না হয় সগরে পৌঁছেই আদায় করবেন। ওখানেই কম্পানির কুঠিতে রাত কাটিয়ে পরের দিন ফিরতি পথ ধরা, তেমন

কঠিন কিছু না।

মুশকিল একটাই, পুরো কাজটাই করতে হবে চুপিচুপি, অত্যন্ত সন্তর্পণে, কেউ যেন কিচ্ছুটি টের না পায়। এমনকি নিজের তিন বেগমের কাছেও এ বিষয়ে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করেননি আহমেদ খান। একই কারণে বেশী লোকলস্কর নেওয়াও বারণ। এক পালকিতে আহমেদ খান নিজে, আরও দুটোয় পেটির মধ্যে একলাখ টিপুশাহী মোহর। লোকজনের মধ্যে তো আঠেরোটি পালকিবাহক কাহার আর এই মহার্ঘ উপঢৌকনের পাহারাদার হিসেবে মাত্তর চারটি ফৌজি সিপাহী কয়েকটি। তা সেই সিপাইদের বিরিয়ানি গোশত খাওয়া বিশাল ভুঁড়ি দেখে অবজ্ঞায় নাক শিঁটকোলেন উনি, ছোঃ, এই নাকি নওয়াবের দেহরক্ষীবাহিনীর খাস সিপাহি! বিপদে পড়লে সবার আগে এরাই কোতল হবে বেশক। নড়তে চড়তেই তো এদের সময় কাবার।

'জলদি চল বেটা, পা চালিয়ে। মাগরিবের আগে যদি গায়ারাসপুর পৌঁছে দিতে পারিস, মোটা ইনাম পাবি' এই বলে কাহারদের একটু তাড়না দিয়ে উনি পালকির দরওয়াজা বন্ধ করলেন। সঙ্গে দু দুটো চান্দির সুরাহি ভর্তি করে বহুমূল্য শিরাজি আর আনিস নিয়ে এসেছেন। এখন দুপাত্তর খেয়ে একটু ঝিমোবেন।

চটকাটা ভাঙ্গলো দিওয়ানগঞ্জ পেরিয়ে সালামতপুরে ঢোকার মুখোমুখি। এক বরকন্দাজ সবিনয়ে এসে জানালো, কিছু গরীবগুরবো লোক এসেছে হুজৌরের কাছে আর্জি নিয়ে, উনি যদি একটু মেহনত করে শোনেন।

জমিতে পা দিয়েই বুঝলেন যে কোমর টাটিয়ে গেছে। খর রৌদ্র মাথার ওপর, মানে জোহরের সময়ও পেরিয়ে গেছে। নিজের ওপরেই বিরক্ত হলেন আহমেদ খান। এভাবে নামাজ আদায় ক্বাজা হলে হাশরের ময়দানে রোজ-এ-কেয়ামতে কি জবাব দেবেন উনি?

চোখ কুঁচকে সামনের তাকিয়ে দেখেন একদঙ্গল গ্রাম্য পথচারী ভারী বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ধূলিধূসরিত খালি পা, শতচ্ছিন্ন পোশাক, মাথায় মলিন পাগড়িতে দারিদ্র্য অতি প্রকট। বেশ কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি গালে, চোখে ভীরু উদাস দৃষ্টি। তা জনা তিরিশ চল্লিশেক লোক হবে। কয়েকজন তো পথশ্রমে কাহিল হয়ে মাটিতেই বসে পড়েছে গাঁঠরি পাশে রেখে। বাকিরা শঙ্কিত দৃষ্টিতে হুজৌরের সাক্ষাতে হাত জড়ো করে দণ্ডায়মান।

একটি দীর্ঘদেহী লোক এগিয়ে এল। মাথার টিকি দেখে বুঝলেন যে এ ব্রাহ্মণ, হয়তো বা দলের নেতাও। ফাটা ফতুয়ার ফাঁক দিয়ে নোংরা জনেয়ু উঁকি দিচ্ছে।

রাগ হয়ে গেল আহমেদ খানের। এই হিন্দু বরাম্ভনের বাচ্চাটা কি চায় এখন? এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে মনে হচ্ছে অনেক।

"কি চাই হে", খ্যাঁক করে ওঠেন আহমেদ খান।

"হামলোগ বহোত গরীব আদমি আছি হুজৌর। কুম্ভমেলা থেকে গাঁওদেহাতে ফিরে

যাচ্ছি। রাস্তাঘাট ভালো না, কখন কি পরেশানি হয় কিছু বলা যায়? হুজৌর যদি মেহেরবানি করে এই বদনসিবদের সঙ্গে থাকার ইজাজত দেন, তো বহুত শুকরগুজার থাকবে এই বান্দা"।

না, লোকটা বেতরিবত নয়। তবুও আহমেদ খান হাঁকিয়েই দিচ্ছিলেন। সঙ্গে মেলা টাকাকড়ি আছে, এই লোকজন নিয়ে বেফালতু ঝামেলা বাড়াবার কোনও মানেই হয় না। যদিও টাকার ব্যাপারটা কাহাররা অবধি জানে না, তবুও অনজান খতরা ঘাড়ে নিয়ে লাভ? তাছাড়া এইসব ঘিনঘিনে নোংরা ভিখিরির বাচ্চা গেঁয়ো লোকগুলোকে শখত নাপসন্দ আহমেদ খানের, ফলে হাতের ইশারায় সিপাহীদের সর্দার বুল্লা খাঁকে ডেকে পাঠালেন উনি।

"এদের যেতে বল বুল্লা খাঁ। বেকার ঝঞ্ঝাট বাড়ানোর শওখ নেই আমার। এখনও বিদিশা অবধি পৌঁছইনি। হারামির অওলাদ কাহার গুলো করছেটা কি? কোড়া লাগাও সালোঁকো, দওড়াও ইনকো জলদি। আর এই ভিখিরিগুলোকে নিজেদের রাস্তা দেখতে বল, যত্তসব ফালতু হুজ্জোত।"

আদেশ শুনেও বুল্লা খাঁ দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে থাকে, নড়ার কোন লক্ষণই দেখায় না।

"কি হলোটা কি? কথা কানে যাচ্ছে না?" ধমকেই ওঠেন উনি।

"মালিক, এরা গরীব ইনসান, সঙ্গে থাকলে একটু লোকবল বাড়ে। একটু গপশপ করতে করতেও যাওয়া যায়। বেসাহারা মজবুর লোগ সব...."

বুঝলেন আহমেদ খান। এই লম্বা বেহড়ের সুনসান রাস্তায় এদেরও তো দুটো কথা বলা লোক চাই। তাছাড়া বুল্লা খাঁ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও তো এইদিককার গাঁওদেহাতেরই মানুষ। দুটো সুখদুঃখের কথাই না বলবে দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে। থেকেই যাক তাহলে এরা, সঙ্গে চলুক। চোখের ইঙ্গিতে এদের সঙ্গে আসার ইজাজত দিয়ে পালকিতে উঠে পড়েন উনি, যদিও প্রৌঢ় বরাস্তনটির আভূমি সেলাম ওঁর নজর এড়ায় না।

বহর ফের চলতে শুরু করে, কিন্তু আগের চেয়ে শ্লথগতিতে। স্বাভাবিক। এই উটকো জুটে যাওয়া চল্লিশজন না কাহার না সিপাহি, গাঁওদেহাতের গরীবগুরবো লোকজন সব। যাগগে যাক। মাগরিব না হোক, আসরের নামাজের আগে গায়ারাসপুর পৌঁছলেই হল। গায়ারাসপুর ছোট গঞ্জ মতন। ভালো অম্বুরি তামাক পাওয়া যায়। অম্বুরি তামাকের কথায় মনে পড়লো, পরের মাসে অম্বরে গিয়ে....

একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলেন উনি। বুল্লা খাঁ এসে গলা খাঁকারি দিতে ঝিমুনিটা ভাঙে। বিদিশা এসে গেছে, হুজৌরের হুকুম হলে এখানেই দস্তরখান লাগানো হোক?

খানাটা একটু গুরুপাকই হয়ে গেছিল, দেরিও হয়ে গেছে খুব। ওঁকে কাল দুপুরের মধ্যে সগরে পৌঁছতেই হবে, ফিরলেই আবার একটা মেহফিল আছে বড় । বেশকিছু মোহর খসিয়ে লাখনৌ থেকে বেগম সামরুকে আনা হয়েছে। বেগম সমরুর ক্ষীণ কটি, উদ্ধত স্তন, আর ঝটকা ঠুমকা মনে পড়তেই আহমেদ খানের গলা শুকিয়ে উঠলো। হাঁকার

পাড়েন উনি,

"বুল্লা খাঁ, জলদি চলো। দের হয়ে যাচ্ছে বহুত"।

এরপর একটু জোরেই দৌড়তে থাকে বহর। খিজিরপুর পেরিয়ে গেলো মুহূর্তেই। এরপর আরোনা, দোহুরা আর তারপরেই গায়ারাসপুর। আজকের মতন ডেরাডাণ্ডা বাঁধবেন উনি। রাত্তিরে রাহতোগড় পৌঁছতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কাল সকাল সকাল বেরোলেই দুপুরে সগর পৌঁছে যাবেন।

মাঝখানে দু দুবার বুল্লা খাঁ এসে প্রস্তাব দিয়েছে একটু জিরিয়ে নেওয়ার। যথেষ্ট প্রলোভন থাকা সত্বেও সে ইচ্ছে দমন করেছেন আহহমেদ খান। আনিস এখনও আধা সুরাহি আছে, শিরাজি প্রায় পুরোটাই। যা মৌজমস্তি, সেটা গায়াসপুর পৌঁছেই করবেন।

এমন সময়ে হঠাৎ আবার থেমে গেলো বহর। টং করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল আহমেদ খানের। পালকি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেই লাল লোহুলোহান চোখে ইতিউতি তাকালেন, কোথায় সেই বেয়াদব বুল্লা খাঁ, পারলে আজই বরখাস্ত করেন এই ইবলিশের বাচ্চাকে। এত টাকা নিয়ে এতদূর যাচ্ছেন, তার মধ্যে উটপটাং ঝামেলা জড়াচ্ছে কে? এই নিচুজাতের ভিখিরি আতরাফ বুল্লা খাঁ কি ভেবেছেটা কি নিজেকে?

বুল্লা খাঁ বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে মালিক বহোত নাখুশ হয়েছেন। সশঙ্কচিত্তে এগিয়ে এসে বলে "গোস্তাখি মাফ হুজৌর, এদিকে একটু তশরিফ নিয়ে এলে বান্দা ব্যাপারটা বোঝাতে পারে। কসুর মাফ, লেকিন মজবুর মুসলমানকে সাহায্য করা উম্মতি সুন্নাহ বলে বহর থামাতে বাধ্য হয়েছি মালিক"।

"কি হয়েছে টা কি?" একটু রূঢ়স্বরে প্রশ্ন করেন আহমেদ খাঁ, "মাগরিবের নমাজ গায়ারাসপুরে আদায় করতে চাও কি চাও না সেটা স্পষ্ট করে বলতো বুল্লা খাঁ।"

"মালিক, একটু মেহনত করে এদিকে দেখুন "।

ঘাড় ঘোরাতেই কারণটা বুঝতে পারলেন আহমেদ খাঁ।

একটু দূরে জনাদশেক লোক, মুসলমানি সিপাহির পোশাক পরনে। মাটিতে শোয়ানো একটা সাদা কাপড় দিয়ে মোড়া মৃতদেহ ঘিরে জবুথবু হয়ে বসে আছে। বিলাপের চিহ্ন সর্বাঙ্গে স্পষ্ট। এদেরই একজন সর্দার গোছের লোক উঠে আসে, আভূমি সেলাম ঠোকে, "আসসালাম ওয়ালেকুম হুজুর"।

"ওয়ালেকুম আসসালাম। কি হয়েছে বিরাদর?"

"মালিক, আমরা কম্পানির সিপাহি। আউধ যাচ্ছিলাম ফৌজে যোগ দিতে। কি নসীব দেখুন, রাস্তায় এই সাথি উলটি করতে করতে ফৌত হয়ে গেল । বাকি সবাই তো এগিয়ে গেছে। এই আমরা দুচারটে মুসলমান এর কবর দেবার জন্যে বসে আছি। মুশকিল এই হুজুর, যে আমাদের মধ্যে তেমন লিখাপড়ি কেউ নেই যে নামাজ-এ-জানাজা আদায়

করবে। হুজুর আলেম লোক মালুম হয়। মেহেরবানি করে যদি একটু নামাজটা পড়ে দিতেন তো আমাদের দোস্তকে মাটি দিতে পারতাম। হুজুর পাকসাফ লোক মালুম হয়, যদি মেহেরবানি করে একটু...." বলে লোকটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

আহমেদ খানের মন দয়ার্দ্র হয়ে ওঠে। আজলাফ হোক, আরজাল হোক, মুসলমান তো বটে। তিনি, প্রবল প্রতাপশালী আহমেদ খাঁ, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে মুসলমানের বাচ্চা গোর পাবে না, এ হতেই পারে না। উনি ঘাড় ঘুরিয়ে বুল্লা খাঁকে ওজুর জল আনতে বলেন।

ততক্ষণে কাহাররা দূরে সরে গেছে। জায়গাটা ঘন জঙ্গল মতন, লাকরাদৌনের আগের কোন জঙ্গুলে জায়গা মালুম হয়। বড় রাস্তা একটু দূরে, কাছেই একটা বিল। সেদিক থেকে বাতাস বইছে ঝিরিঝিরি। বিলের পাশ দিয়ে ঘন জঙ্গল। সিপাহিরা একটু ঢিল দিয়েছে। তা দিক, এতক্ষণ ধরে দৌড়ে আসছে। বুল্লা খাঁ ওর ঘোড়াটার পা দুটো একটু দলাইমলাই করে দিচ্ছে, আহা করুক। ঘোড়া, তলওয়ার আর ভুখা পেট ছাড়া বেসাহারা সিপাহির আর আছেটাই বা কি, অ্যাঁ?

যেটা উনি এতক্ষণ খেয়াল করেননি, সেটা হচ্ছে যে কোন এক অদৃশ্য সুতোর টানে সেই বেসাহারা পথিকদের মধ্যে অনেকে উঠে এসে প্রতি সিপাহির পাশে তিনজন করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঠিক পাশে নয়, একজন করে পিছনে, দুইজন করে দুই পাশে।

এদের মাঝখানে, সেই দীর্ঘদেহী উপবীতধারী ব্রাহ্মণ দলনেতাটি অত্যন্ত নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে এসে দাঁড়ালেন। পুরো দৃশ্যটির মাঝে আমোঘ নিয়তির মতন।

ওজুর জল এল বিল থেকে। মৃতদেহসঙ্গী মুসলিম সিপাহিরা একটু সরে এল। তাদের মধ্যেও তিনজন করে খুবই সশ্রদ্ধভাবে আহমেদ খান আর বুল্লা খাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালো।

ঠিক পিছনে নয়, একজন করে পিছনে, দুইজন করে দুই পাশে।

কাহাররা দূরে জটলা করছে, বাতাস নিঃশব্দে বয়ে চলেছে, দূরে কোথাও একটা ঘুঘু একটানা ডেকে চলেছে।

আহমেদ খান নিচু হয়ে ওজু করলেন, তারপর এসে দাঁড়ালেন মৃতদেহের সামনে। ওঁর দুইপাশে দুই শোকস্তব্ধ মুসলমান সিপাহি, মৃতবন্ধুর সদগতি কামনায়। একজন পিছনে।

এমন সময়ে সেই প্রৌঢ় ব্রাহ্মণটি অনুচ্চ কিন্তু তীব্র স্বরে বললেন 'পান কা রুমাল লাও'।

নামাজ এ জানাজা পড়ার আগে একটু ধন্ধে পড়ে গেলেন আহমেদ খান। এই বুরবক হিন্দু বরাম্ভন কি জানে না যে এখানে কারও গোর হতে চলেছে? এইটা কি তোর রুমাল হাতে পান খাবার সময়? কম্পানির রাজত্বে এই হিন্দুগুলো বহুত বদতমিজ হয়ে উঠেছে। গোর দিয়ে উঠেই উনি এর খবর নেবেন, এই মনস্থির করে উনি তিনবার আল্লাহু আকবর বলে নামাজ পড়তে শুরু করেন।

মৃতদেহের কাছে এসে একটু ঝুঁকে আহমেদ খান সবে উচ্চারণ করেছেন 'আল্লাহুম্মাগফিরলি হায়িনা ওয়া মাইতিনা ওয়া', এমন সময় শুনলেন সেই প্রৌঢ় দরিদ্র গ্রাম্য ব্রাহ্মণটি গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন 'সাহেব খান, তামাকু লাও'।

তীব্র রোষে ঘাড় ঘোরাবার আগেই আহমেদ খান ক্ষণিকের ভগ্নাংশে দেখলেন যে একটা হলুদ রঙের সিল্কের রুমাল পিছন থেকে উড়ে এসে ওঁর গলায় বসে দ্রুত শক্ত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে দিলো। জ্ঞান হারাবার আগে স্তম্ভিত চোখে ভোপালের ওয়াজির-এ-আজমের খাস সহচর আহমেদ খান দেখলেন যে ওঁর সামনে শোয়ানো মৃতদেহ কোন জাদুমন্ত্রবলে জিন্দা হয়ে লাফিয়ে উঠে ওঁর ঘাড় ধরে নিচের দিকে টানছে। আতঙ্কিত চোখে এইসব দেখে উনি 'ইয়া আল্লা' বলতেও ভুলে গেলেন। যদিও সেসব ভাবার সময়ও পাবার আগেই পিছন থেকে একটা হাঁটু ওঁর মেরুদণ্ড বরাবর সামনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে কড়াক আওয়াজ করে মেরুদণ্ডটি ভেঙে দেয়।

সেই আলো আঁধারিয়া সন্ধ্যায়, অজানা সড়ক ঘেঁষে, লাকরাদৌনের পাশে এক জঙ্গুলে বিলের ধারে আহমেদ খানের চোখে যে চির অন্ধকার নেমে এল তা আর ঘুচে যাবার নয়।

'***
****

জব্বলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ক্যাপ্টেন ম্যালোনি যখন অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ভোপাল থেকে আগত সংবাদদাতাকে বিদায় দিলেন, তখন সগরের এই কম্পানিকুঠিতে গ্রীষ্মের দুপুরেই অন্ধসাঁঝআঁধারের হিমশীতল স্তব্ধতা।

বিশেষ দূত মারফত ভোপাল নওয়াব ওয়ান ল্যাক টিপুশাহী গোল্ড কয়েন পাঠিয়েছিলেন, অ্যাট দ্য বিহেস্ট অফ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক হিজ হাইনেস, গভর্নর জেনারেল অফ ইণ্ডিয়া। ক্যাপ্টেন ম্যালোনির ওপর দায়িত্ব ছিল সেই 'আর্জেন্ট কনসাইনমেন্ট' লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে উইথ ডিউ সিকিওরিটি পাঠিয়ে দেওয়া। এই কাজের পাত্তা কারও হাতে লাগার কথা নয়। সিক্রেসি ইজ অফ আটমোস্ট ইম্পর্ট্যান্স হিয়ার। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাই আর কাউকে ভরসা করেনি। ঈটনের ছোটবেলার বন্ধু ডিক, অর্থাৎ রিচার্ড ম্যালোনিকেই এই কনসাইনমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি দিয়েছিল।

'অ্যান্ড আই ফেইল্ড টু কম্পলিট দিস সিম্পল গডড্যাম টাস্ক' মনে মনে এই কথা বলে দেরাজের ওপর অন্ধ আক্ষেপে একটা সজোর ঘুষি মারলেন ক্যাপটেন ম্যালোনি।

সেই আওয়াজ শুনে খাস অর্ডারলি মুহম্মদ খাঁ দৌড়ে এল, "কোঈ সেবা মেরে মালিক?"

ম্যালোনির ইচ্ছে হলো জাস্ট জুতিয়ে এই লোকটার মুখ ছিঁড়ে দিতে। ব্লাডি ভিখিরি নেটিভ সব, পরনে নোংরা সব ধোতি আর পাগড়ি, সুপারস্টিশনের ডিপো, ইললিটারেট ফুল এক একটা। এই ব্লাডি ব্রাউন নিগাররা এত ট্রাবল দেবে জানলে উনি হোম পোস্টিং

ছেড়ে এই ফাকিং স্টুপিড কান্ট্রিতে আসতেনই না।

ক্যাপ্টেন ম্যালোনি স্থির সাপের চাউনিতে বলেন "ছোটে সাহেব কো এত্তেলা দো নিগার। আবভি"।

একটু পরেই এক ইংরেজ যুবাপুরুষ এসে সামনে দাঁড়ালেন।

"গুড আফটারনুন ক্যাপ্টেন ম্যালোনি"।

"গুড আফটারনুন জেন্টলম্যান। খবরটা শুনেছো?"

"ইয়েস ক্যাপ্টেন। কালকেই একটা খবর কানে এসেছিল। আজকে ইনভেস্টিগেট করে এলাম। আপনি আর আমি বোধহয় একই আন্দাজ করছি, এবং সেই সন্দেহটাই বোধহয় ঠিক"।

"এক্সপ্লেইন প্লিজ"।

"রাহাতগড়ের বাজারে আজ এক পুওর আননোন ভিলেজার দুটো সিলভারের জার আনে। একটা ফুল, আরেকটা হাফ ফিলড।"

"হুম। সো?"

"দুটোতেই খুবই এক্সপেনসিভ লিকার ছিল। আনিস আর শিরাজি। এদিককার লোক এইসব চোখেও দেখেনি। রাজা বা নওয়াব ফ্যামিলি ছাড়া এসব অ্যাফোর্ড করার ইম্পসিবল "।

"অ্যান্ড?"

"সিলভার জার দুটো দেখার মতন। সপ্লেন্ডিড ক্র্যাফটসম্যানশিপ, উইথ বিউটিফুল ইন্ট্রিকেট ডিটেইলিং। আ পারফেক্ট ওয়ার্ক অফ আর্ট। রাস্তাঘাটে এ জিনিস পাওয়ার কথা নয় ক্যাপ্টেন।"

"আর ইউ শিওর?"

"অ্যাবসোলিউটলি"।

"কুড ইউ ট্রেস দ্যাট গাই? "

"নাহ। লোকটা দাম নিয়েই হাওয়ার মতন মিলিয়ে গেছে। দুটো জারই কনফিসকেট করে নিয়ে এসেছি। আহমেদ খানের বাড়ির লোকজন নিশ্চয়ই আইডেন্টিফাই করতে পারবে জার দুটোকে"।

"সো, তোমার কথাই মনে হচ্ছে ঠিক। ওকে। প্লিজ প্রসীড টু ন্যাব দিজ মার্ডারার্স। ক্যাচ

দেম অ্যান্ড হ্যাঙ্গ দেম। ইটস দ্য ডিউটি অফ হোয়াইট পিপল লাইক আস টু ব্রিং ল অ্যান্ড অর্ডার ইন দিস গড ফোরসেকেন প্লেস। যা সাহায্য চাইবে, পাবে। যখন চাইবে তখনই। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক"।

"থ্যাংক্স ক্যাপ্টেন"।

ফিরে চলে আসছিলেন যুবকটি। পিছন থেকে ডেকে ওঠেন ক্যাপ্টেন ম্যালোনি। উঠে এসে যুবাপুরুষটির কাঁধে হাত রাখেন। সস্নেহে বলেন " দিজ পিপল আর ডেঞ্জারাস, ভেরি ডেঞ্জারাস। বি এক্সট্রিমলি কশাস ডিয়ার"।

"ইয়েস ক্যাপ্টেন।"

"টেক কেয়ার অফ ইওরসেল্ফ স্লীম্যান। আই উইল ওয়েট ফর ইউ"।

****
****

বিলের থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে শুকনো শরীরটায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়। পাতার সরসরানি আর মাটি কাটার ঝুপঝুপ আওয়াজ ছাড়া আর কোন আওয়াজও শোনা যায় না। নির্জন এই জঙ্গুলে যায়গায় বিন্দুমাত্র আলো নেই, তার ওপর অমাবস্যা। আজ মঙ্গলবারও বটে, মা ভবানীর পূজার প্রশস্ত দিন।

বড় শুভদিন আজ। যুক্তকর মাথায় ঠেকালেন দীর্ঘদেহী ব্রাহ্মণ। মা আজ এতগুলি বলি স্বীকার করেছেন। টাকাও যা পাওয়া গেছে, তা কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি, একলক্ষ টিপুশাহী খোর!

দূরে একটা পেঁচা ডেকে উঠলো। বড় সুলক্ষণ, বড় সুলক্ষণ, অভীষ্ট সিদ্ধির পথে আজ বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবেন উনি। আজ রাতেই। তারপর আর একটি মাত্র সোপান বাকি, তারপরই...

অকস্মাৎ "ঠাকুর" ডাক শুনে সচকিত হন উনি। খোদাবক্স খাঁ সামনে দাঁড়িয়ে। নাহ, অনেক কাজ বাকি, সেগুলি দ্রুত শেষ করতে হবে। প্রথার বাইরে এক পাও চলার উপায় নেই, তাহলেই দলের ওপরে নেমে আসবে মা ভবানীর রুদ্ররোষ। দলের সর্দার হিসেবে এই অনর্থ হতে দিতে পারেন না উনি।

মাটিতে সার বেঁধে শোয়ানো তেইশটি মৃতদেহ। প্রত্যেকের গলায় সিল্কের তৈরি পেলহুর ফাঁসের দাগ।

"বাকিরা কোথায় খোদাবক্স? বিচালি দেখেছো ঠিকঠাক জায়গায় ? বেশ গভীর খুঁড়তে হবে কিন্তু। রাতও বেশী বাকি নেই আর। হাত চালাতে বলো সবাইকে"।

"ধাউর জমাদার, আর মোরাদুন কুর্মি বাকিদের নিয়ে কুরওয়া খুঁড়ছে মালিক। নাসির মাদারি সাদা রুমাল নিয়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিপদ দেখলে ফুরকদেনার জন্যে।"

"বেশ বেশ। কাসসি কার কাছে ছিল?"

"আমার কাছে ছিল মালিক। মন্তর পড়া কোদাল, আর কাউকে দিতে আছে? "

"ভালো। তাড়াতাড়ি করতে বলো"।

"চিন্তা না কিজিয়ে মালিক। ওরা এইকাজে দুরুস্ত। বেশক খানদানী লোক ওরা এ কাজে। নাউরিয়া বয়েস থেকে এইসব দেখে দেখে আর করে করে এসব কাজে এরা ভারী মাহির"।

"ভালো হলেই ভালো।"।

"এমন চিসা শিকার আর কবে মিলবে মালিক, হি হি হি। যা পেয়েছি, আধা জিন্দেগী কেটে যাবে আমাদের। মা ভবানীর কিরিয়া"।

"সুবন হারসুকাকে দুটো খোর বেশী দিও খোদাবক্স। এমন দুরুস্ত তিলহাই কমই দেখেছি। সেই ভোপাল থেকে খবর পেয়ে দৌড়ে এসে জানালো বলেই তো এত বড় দাঁওটা মারতে পারলাম। তাড়াতাড়ি করো, ঠিক বাইশটা কুরওয়া খুঁড়বে। বেশী না। হাত পায়ের জোড় ভেঙে দিয়েছো তো? নইলে আবার দেহ পচে ফুলে উঠে..."

"গুস্তাখি মাফ মালিক। কিন্তু লাশ তো..."

তেইশটা বলার আগেই ব্রাহ্মণের চোখে চোখ পড়ে যায় খোদাবক্সের। অন্ধকারেও ধকধক করে জ্বলে ওঠে সেই চোখ। কঠিন কন্ঠে আদেশ ভেসে আসে,

"যা বলছি তাই করো খোদাবক্স। আর তাড়াতাড়ি করো।"

দ্রুত সন্ত্রস্তপদে ফিরে আসতে আসতে ভয়ে ত্রাসে ঘেমে ওঠে খোদাবক্স খাঁ। এই লোকটির মধ্যে কি আছে বোঝাতে পারবে না ও, কিন্তু চোখে চোখে রাখলে একটা সিরসিরে শীতল অনুভূতি হয়। একটা ভয়জড়িত অস্বস্তি। কম কথা ও দৃঢ় ব্যাক্তিত্বের এই ব্রাহ্মণটির মধ্যে একটা অদেখা শীতল নিষ্ঠুরতা আছে, যা শুধুমাত্র ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ছাড়া ব্যাখা করা অসম্ভব।

তিন সন আগে হঠাৎ করে ভুকোত জমাদারের ঘরে ইনি এসে উপস্থিত। ভুকোতই তখন ছিল দলের সর্দার। যেমন সাহস ছিল ভুকোতের তেমনই ছিল বুদ্ধি। গাঁয়ের কেউ জানতে পারেনি ভুকোতের দলের আসল কাজ কি। বারিষ কা মৌসুম শেষ হলো কি ভুকোত তার দলবলসমেত বেরিয়ে পড়তো। পড়োসিরা জানতো যে এরা কাজের খোঁজে দূরগাঁও যাচ্ছে। তারপর কয়েক মাস পরে পয়সা কামাই হলে ফিরে আসবে। বিবির

জন্যে আনবে নতুন শাড়ি আর কুমকুমের বিন্দি। বালবাচ্চার জন্যে আনবে নতুন কাপড় আর খেলনা। তারপর পঞ্চায়েতের বড় বারগত পেড়টির নিচে বসে গাঁওবুড়োদের সঙ্গে হুঁকো খেতে খেতে গাঁওদেশের আজব সব কিস্যা শোনাবে। আর পাঁচটা বাহারগাঁওতে কাজ করতে যাওয়া মরদ যেমন হয় আর কি

কিন্তু ভুকোতের দল দূরদেশে গিয়ে রোজগার করা আর পাঁচটা দেহাতি মরদদের দলের থেকে আলাদা ছিল।

একদম আলাদা।

শরতের শুরুতে, কোনও এক শনি বা মঙ্গলবার দেখে, যাত্রা শুরুর আগে এক এক করে খোদাবক্স, ধাউর, মোরাদুন, সুবন, ছুটনিয়া, এরা ভুকোতের বাড়ি এসে জড়ো হতো। দরজা বন্ধ করে শুরু হতো বিশেষ উপচার। খুঁড়ে তুলে আনা হতো বিশেষ মন্ত্রপূত কোদাল, কাসসি। তাকে পুজো করে, চিনির জল, ঘোল আর দেসি মদ দিয়ে ধুয়ে, সাতবার আগুনে সেঁকে, সাত সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে শুদ্ধ করে সেই মন্ত্রপূত কোদাল তুলে দেওয়া হতো বিশেষ কারও হাতে।

তারপর একটি বিশেষ ভাবে তৈরি রুমাল হাতে নিয়ে, যার নাম পেলহু, এরা বেরিয়ে পড়তো। হাঁটতে থাকতো মাইলের পর মাইল। অপেক্ষায় থাকতো শিকারের, অপেক্ষায় থাকতো মা ভবানীর নির্দেশের। কোন তিলহাই বা গুপ্তচর এনে দিত কাঙ্ক্ষিত খবর, এই পথেই সদলবলে আসছে কোন এক ব্যবসায়ী, সঙ্গে দুটি খোনতুরি, বাচ্ছা মেয়ে। দলের মধ্যে যারা দক্ষ সোথা তারা গিয়ে আলাপ জমিয়ে, বন্ধুত্ব পাতিয়ে, ভুলিয়েভালিয়ে রাত্রে নির্জন জায়গায় থাপ, মানে তাঁবু ফেলাতো। তারপর রাত্রে শুরু হতো গান আর গল্প। অলক্ষিতে প্রতিটি দুর্ভাগার পিছনে তিনজন করে এসে দাঁড়াতো।

একজন পিছনে। দুইপাশে দুই জন।

পিছনে দাঁড়ানো ভুরকোত, অর্থাৎ প্রধান খুনির কোমরে গোঁজা থাকতো সেই কালান্তক পেলহু।

গানে গল্পে আড্ডায় মজে যেতে যেতে কেউ একজন হাঁক দিতো, 'পান কা রুমাল লাও'।

ঘাতকদের হাতে হিলহিলে সাপের মতন নিঃশব্দে উঠে আসতো সেই রুমাল। তারপরেই উঠতো ঝিরণী, কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠতো, "সাহেব খান, তামাকু লাও"।

আর লোকগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে যেত।

লাশগুলোকে চৌকো কুরাওয়া কিংবা গোল গব্বায় ফেলে, মাটি চাপা দিয়ে, তার ওপর বসে মন্ত্রপূত তুপোনির গুড় খেয়ে তারপর শুরু হতো পথচলা। হতভাগ্যদের দলে কোন খোনতুরি থাকলে অবশ্য তাকে ঝিরণী দেওয়া হতো না। বাঘের আশেপাশে যেমন শিয়াল ঘোরে উচ্ছিষ্ট খাবার আশায়, তেমনই এদের সঙ্গে ঘুরতো ব্রিনজাররা। ওদের

কাজই হচ্ছে বাচ্ছা মেয়ে বিক্রি করা। ভুকোতের দলের উপরিলাভ।

তিনবছর আগে এমনই এক যাত্রাশুরুর আগের দিনে ভুকোতের বাড়ি গিয়ে এই ব্রাহ্মণকে দেখে একটু অবাকই হয়েছিল খোদাবক্সরা। কিন্তু যাকে সবার আরও আজব লেগেছিল, সে হচ্ছে ভুকোত নিজে! কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে লোকটা, মুর্দামাফিক হাবভাব। যেন নিজের মধ্যেই নেই, হামেশা একটা ধুনকির মধ্যে রয়েছে। মাথা ঘাড় এতোই নিচু করে রেখেছে যে চোখমুখ প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। কথাবার্তাও বলছে তাজ্জব করা, জানটা যেন কলিজার মধ্যেই নেই। বিড়বিড় করে বলল, এবার থেকে দলের ভার এই ব্রাহ্মণের হাতেই থাকবে। এই দল ভুকোত ছেড়ে দিল।

তাজ্জব কি বাত! ছেড়ে দিলাম বললেই ছেড়ে দেওয়া যায় নাকি? কথা নেই বার্তা নেই, কে এই বরাম্ভন তার হিসেবপতা কিছু নেই, হঠাৎ করে সর্দার বলে মেনে নিতে হবে? রীতিমতো বিদ্রোহ করেছিল খোদাবক্স মোরাদুনরা। কিন্তু ভুকোতের ওই এক কথা। এই দল ভুকোত ছেড়ে দিলো, এই বরাম্ভন এবার থেকে সর্দার, এতে যার ইচ্ছে হবে সে দলে থাকবে, না হলে বেরিয়ে যাবার দরজা খোলাই আছে!

এর ওপরে আর কথা চলে না।

ভুকোতের আওরতকেও তো সেবার দেখাই গেলো না বাইরে আসতে। দুটো কথা যে জিজ্ঞেস করে নেবে, তারও রাস্তা বিলকুল বন্ধ!

আড়ালে আবডালে ওরা চেষ্টাও করেছে ভুকোতকে বোঝাবার। অস্পষ্ট বিড়বিড় করে মাথা নাড়াতে নাড়াতে কি যে বলেছে, তা কেউই বোঝেনি। কথাও বলেছে দূরে থেকে, কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেয় নি, এমন কি জিগরি দোস্ত খোদাবক্সকে অবধি না। শুধু একবার, একবারই, জোর করে ভুকোতের হাত চেপে ধরতে গেছিলো খোদাবক্স, অবিশ্বাস্য রকমের অমানুষী ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে উঠে গেছিলো ভুকোত।

রাতে শুতে যাবার আগে নাসির মাদারি চুপচাপ জিজ্ঞেস করেছিল,

"কি হল ওস্তাদ, কি বুঝলে ভুকোত সর্দারকে"।

"খবর ভালো না। বহুত বড়া গড়বড় আছে। তুই আমি বুঝবো না"

"কেন ওস্তাদ? এরকম বলছো কেন? কিছু দেখলে নাকি তেমন?"

"হ্যাঁ"।

"কি দেখলে ওস্তাদ? একটু খোলসা করে বল না"

"ভুকোতের চোখটা দেখেছিলিস?"

"না ওস্তাদ। কেন? তুমি দেখেছো?"

"হুমম। যখন কাছে গেছিলাম।"

"কি দেখলে ওস্তাদ?"

"ভুকোতের চোখ বিলকুল খালি"।

"মতলব???"

"চোখের পুরোটাই সাদা, আঁখ কি পুতলিটাই নেই"।

"কি বলছো ওস্তাদ? ঝুট বলছো না তো?

"তোকে ঝুট বলে আমার লাভ?"

"ইয়া আল্লা, কিসব কথা বলছো ওস্তাদ?"

"কাউকে বলিস না। ঘুমিয়ে পড়। আরেকটা ব্যাপারও দেখেছি। যখন হাত পাকড়াতে গেছিলাম"।

"কি ওস্তাদ?"।

"ভুকোতের হাত ঠাণ্ডা, বিলকুল ঠাণ্ডা। মুর্দা লাশের মতন"।

****
****

লাকরাদৌনের সেই বিলের পাশে যখন ঘোড়া থেকে নামলেন উইলিয়াম হেনরী স্লীম্যান, তখন দুপুরের রোদের তেজ একটু কমেছে। তবে গরমের তাতটা একটুও কমে নি। তাতে অবশ্য স্লীম্যানের বিশেষ কিছু এসে যায় না। ভারতবর্ষের প্রখর সূর্যের প্রভাবে ইতিমধ্যেই খাঁটি ইংরেজটির গাত্রবর্ণ ঘোর বাদামি। বাদামি গাত্রচর্ম ছাড়াও ভারতবর্ষের আরেকটি দান সশ্রদ্ধায় বুকে তুলে নিয়েছেন ইনি, ভাষা। উত্তরভারতে বলা হয় অথচ ইনি জানেন না, হেন ভাষা নেই, এমনকি পুশতু অবধি!

স্লীম্যান নেমে ঘোড়াটাকে একজন সিপাইয়ের হাতে ধরে দিলেন। লম্বা লম্বা পা ফেলে পর্যবেক্ষণ করলেন পুরোটা। বিলের প্রায় পুরোটাই ঘুরে এলেন। ঝোপঝাড় গুলো সরিয়ে সরিয়ে দেখলেন। জঙ্গলের দিকেও খানিকটা গেলেন। সঙ্গে আসা জনাবিশেক সেপাই প্রায় ঝড়ই তুলে দিল আশেপাশে।

শুধু একজন দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। সে শুধু মাটি দেখছিল। আর কিছু না। তার জহুরী চোখ শুধু একটা চেনা দাগ খুঁজছিল, শুধুমাত্র বহুদিনের অভিজ্ঞতা ছাড়া যে দাগ খুঁজে বের করা শুধু মুশকিলই নয়, বস্তুত অসম্ভব।

হঠাৎ করে চেঁচিয়ে ওঠে সে, "হো সাহেব, মিল গ্যায়া। এদিকে আসুন"।

দৌড়ে আসেন স্লীম্যান, "কাঁহা? হোয়ের? হাউ ক্যুড ইউ..."

সেই মানুষটি একটা লম্বা গাছের ডাল নিয়ে বিলের ঠিক সামনে একটা বিশাল বর্গাকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দেয়, "আপনার ফৌজকে বলুন এখানে খুঁড়তে"।

"এখানেই পাওয়া যাবে বলছো?"

"বেশক সাহেব, নইলে আমার নামে কুত্তা পালবেন"।

সাহেবের অঙ্গুলিহেলনে কুড়িজন দেশিয় সিপাই ঝুড়ি কোদাল নিয়ে নেমে পড়ে, একটু দূরে অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা করতে থাকেন স্লীম্যান আর তার সঙ্গী।

****
****

বাইশটি মৃতদেহ কুরওয়াতে শোওয়ানো। শুধু একটি মৃতদেহ, এক অল্পবয়সী হিন্দুস্তানী কাহারের লাশ আলাদা করে রাখা।

ঝপাঝপ মাটি পড়তে থাকে কবরে।

নাসির খান মাদারি একজন দক্ষ কুথাওয়া। মৃতদেহের হাতেপায়ের জোড় ভেঙে, ভাঙা হাঁটু থুতনি অবধি তুলে কবরে শোয়াতে ওর জুড়ি নেই। ছুটনিয়া দোসাদও ওর একজন যোগ্য সহকারী। ছুটনিয়া আরও একটা কাজ সবার থেকে ভালো পারে, সে একজন দক্ষতম ফুরজানা। কবর হবার পর, সবকিছু পরিষ্কার করে, মাটির সমান করে মিলিয়ে দিয়ে, আগের চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াতে তার প্রতিভা অবিশ্বাস্য।

ছুটনিয়া সেই কাজই করছিল মন দিয়ে। শেষ হলে একটা সাদা চাদর এনে পেতে দেয় কবরের ওপর। শুরু হয় প্রথামাফিক ভোজসভা। মন্ত্রপুত তুপোনির গুড় তুলে দেওয়া হয় সবার মুখে।

সাচ্চা আউলা বা সুন মাত্রেই এই গুড়কে অমৃততুল্য জ্ঞান করে। ভোজসভা শেষ হলে, একজন সদস্যকে মাউলি বানানো হয়। তার কাজ সামান্যই। পরিবার প্রতি শিকারের ভাগ নিয়ে দলের সবার বাড়ি বাড়ি সেই ভাগ পৌঁছে দেওয়া।

সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পর সেই দীর্ঘদেহী ব্রাহ্মণ উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় আদেশ করলেন, "তোমরা বুরোউতের রাস্তা ধরে খিজিরপুরের দিকে যাও। কাল সকালে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো।"

এই প্রৌঢ়ের আদেশে এক কর্তৃত্বব্যঞ্জক দৃঢ়তা থাকে। অচেতন পরতে কিছু ক্রুর শীতলতাও মিশে থাকে নির্ঘাত। নইলে কেউ মুখ তুলে কিছু জিজ্ঞাসা করে না কেন? কই, ভুকোতের সময় তো এমন হতো না, সে তো সুখেদুঃখে সবার সঙ্গেই থাকতো। মা ভবানীর প্রতিটা প্রসাদের পর সে একটি লাশ নিয়ে দল থেকে আলাদা হয়ে গেছে কোনদিন? কে এই ব্রাহ্মণ? প্রতিবার কি করে এক একটা তাজা লাশ নিয়ে?

এসব ভাবনা খোদাবক্সের মাথা গুলিয়ে দেয়। অব্যক্ত একটা ক্রোধ তার শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসতে চায়। কিন্তু কোথায় যেন প্রতিবাদটা বোবা হয়ে আসে।

ভয়? বিষাদ? বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনা?

হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে সাজিয়ে নেয় খোদাবক্স। তা নয়। এই হাতে কম করে দুশোর বেশী খৌরকে কবরে পাঠিয়েছে খোদাবক্স। ডর কাকে বলে ও জানে না। আজ তক আঁচড় অব্দি লাগেনি। মা ভবানীর কৃপা ছাড়া আর কি হয় এসব?

কিন্তু ভুকোত? মাথার ওপর বটগাছের মতন ছায়া হয়ে থাকা ভুকোত? তিন বছর আগে সেই শেষ সাক্ষাতের পর হঠাৎ করে একদিন চিতায় ছাই হয়ে যাওয়া ভুকোত? তার ভালোবাসার ঋণ কি করে শুধবে খোদাবক্স খাঁ?

ভুকোতের সঙ্গে সুখেই ছিল সবাই। সুখ, মিলেমিশে থাকার বেরাদরি সুখ। এই ব্রাহ্মণ যবে থেকে দলের রাশ হাতে নিয়েছে, দলের হাতে টাকা এসেছে বিপুল। তিন বছরে অন্তত বিশবার বিভিন্ন দলের ওপর খোমুসনা হয়েছে তারা। থিবাই দিয়ে, অর্থাৎ ভুলিয়েভালিয়ে বসিয়ে দিয়ে ঝিরণী দিয়েছে অসতর্ক মুহূর্তে। আশ্চর্যজনক ভাবে প্রতিবারই দেখা গেছে তারা পেয়েছে চিসা শিকার, সম্পন্ন গৃহস্থ। ফুলেফেঁপে উঠেছে দলের সবার সম্পদ। বাকি দলগুলো তো রীতিমতো ঈর্ষা করতে শুরু করেছে এদের। হবে নাই বা কেন? তাদের কপালে জুটেছে সব ফালতু ভাঙ্গি, গরীব দেহাতি লোকজন। নেহাত ভবানীর আদেশ, কোন শিকারকে ছেড়ে দিতে নেই, তাতে মায়ের অসম্মান হয়, তাই তাদেরও কবরস্থ হতে হয়েছে। পয়সা পেয়েছে যৎসামান্যই।

ফিরে আসছিল খোদাবক্স। তার মনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। ভুকোতের শাসনে বড় ভাইয়ের প্যায়ার মিশে থাকতো। এই ব্রাহ্মণ শুধু জানে আদেশ করতে। আর সেই আদেশে মিশে থাকে কঠিন নিষ্ঠুরতা। তাকে অমান্য করার কথা ভাবাও পাপ। লোকটা যেন সব জানে, সব বোঝে, সর্বত্র চোখ তার। ঠাণ্ডা চোখে যখন তাকায়, কলিজাটা জমে যায় বরফের মতন। মনে হয় লোকটা ভেতরের সব কিছু পড়ে নিচ্ছে।

আরও আশ্চর্যের কথা এত খোর, তামার ক্রুস, সেটাকের গয়নাগাটি, লোকটা এর এক পয়সাও ভাগ নেয় না! তাহলে এসেছে কেন এই দলে? কি চায় ও? কিসের লোভে পড়ে আছে ও? আর প্রত্যেকবার একটা করে তাজা লাশ নিয়ে কি করে ও? কোথায় যায় একা একা ? বারবার এই লাকরাদৌনেই ও বিয়াল খোঁজে কেন? কি আছে জঙ্গলের ভিতর? আর কোন মন্ত্রবলে সকাল হতে না হতেই দস কোস হোক, বিস কোস হোক, ঠিক পৌঁছে যায় দলের কাছে? কি কৌশলে?

নাসির চুপচাপ হাঁটছিল পিছনে, এবার একটু পা চালিয়ে ধরে খোদাবক্সকে,

"কি ভাবছো ওস্তাদ? চুপচাপ যে। এবার তো মা ভবানী ছপ্পড় ফাড়কে পয়সা দিয়েছেন। নসীবে এত পয়সা ছিল, ভেবেছিলে কোনদিন?"

"হুমম"।

"একটা কথা বলবে ওস্তাদ?"

"বল। শুনি"।

"গুসসা করবে না তো?"

"বল। জ্যায়াদা তামাশা করিস না"।

"এই লোকটা প্রত্যেকবার একটা লাশ নিয়ে কি করে?"

"আমি কি করে জানবো বুরবক? আমি কি ওর সঙ্গে থাকি?"

"আরে, গুসসা কেন করো ওস্তাদ। বলছি তোমার কি মনে হয়? কি কি করতে পারে লোকটা লাশ নিয়ে?"

"কাঁচা কাঁচা খায়। বুঝেছিস? চুপ থাক"।

"ইয়া আল্লাহ।"

এরপর দুজনে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পরে খোদাবক্স। নাসির কে বলে,

"তুই পা চালিয়ে যা। আমি এক দোস্তের সঙ্গে দেখা করেই আসছি। এক রোজ বাদ মিলবো। খিজিরপুরের কাসটম হোউসের আশেপাশে থাকিস। পৌঁছে যাবো। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলে সত্যি কথাই বলিস"

"কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো ওস্তাদ?"

"দোস্ত। বললাম তো"

"নাম বললে না যে?"

"কি করবি তুই নাম জেনে?"

বলে ক্ষণিকের জন্যে থেমে যায়।

"কাউকে বলিস না কিন্তু। ফিরিঙ্গিয়া, ওর নাম হল ফিরিঙ্গিয়া"।

****
****

"একটা কথা খেয়াল করেছেন সাহেব?"

নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্লীম্যান। কথাটা কিছু পরে ওঁর কানে পৌঁছয়। ততক্ষণে সামনে কতগুলো পচে যাওয়া লাশ কবর থেকে উঁকি দিচ্ছে। লাশপচা গন্ধে বাতাস ভারী। দুএকটা শকুনও ওড়াউড়ি করতে শুরু করেছে এদিকওদিক।

"বলো"।

"ভোপাল থেকে কি খবর পেলেন সাহেব? কতজন ছিল বহরে? সবশুদ্ধু?"

"আঠেরোটা কাহার, চারটে সিপয়, আর আহমেদ খান নিজে। তেইশ। টুয়েন্টি থ্রি"।

"কটা লাশ দেখতে পাচ্ছেন সাহেব?"

ওয়ান টু করে গুনতে শুরু করেন স্লীম্যান। "টুয়েন্টি টু। স্ট্রেঞ্জ! আরেকটা বডি গেলো কোথায়?"

চোখ কুঁচকে উনি সঙ্গীটির দিকে তাকান। দুচোখে প্রশ্ন আর সংশয়।

সঙ্গীটি মাথা নিচু করে কি যেন ভাবতে থাকে। ওকে ঘাঁটান না স্লীম্যান। এই অসম লড়াইয়ে এই লোকটিই ওঁর অন্ধের যষ্ঠি।

"দো সাল আগে আমার এক দোস্ত একটা আজব কথা বলেছিল আমাকে। তখনও আমি আপনার হাতে ধরা পড়িনি। অচানক নাকি তাদের সর্দার বদল হয়ে গেছে। আগের সর্দার নাকি মুর্দা লাশের মতন হয়ে গেছিলো অচানক। তখনই নাকি এক বরাস্তন নতুন সর্দার হয়ে বসে, আর তারপর থেকেই নাকি দলের নসীব গেছে ফিরে। মা ভবানী নাকি ধনদৌলত ছপ্পড় ফাড়কে এনে দিচ্ছেন ওদের। কিন্তু.."

"কিন্তু কি?"

"সর্দারটি নাকি বড় আজিব কিসিমের"।

"এক্সপ্লেইন"।

"ধনদৌলত পয়সাকড়ি কিচ্ছু নেয় না। শুধু লাশ নেয়"।

"হোয়াট?" সচকিত হয়ে ওঠেন স্লীম্যান, লাশ নেয়? শুধু লাশ নেয়??? মানে কি এর?

"জানি না সাহেব। এসব আমাদের প্রথার বাইরে। আমাদের প্রথায় সবাইকে, সবাইকেই কবর দেওয়াটাই নিয়ম, ছোটবেলা থেকে তাই শুনে এসেছি। কিন্তু এই বরাম্ভনের ওপর কেউ কথা বলতে পারে না সাহেব। সবার মনে এমনই খওফ বানিয়ে রেখেছে লোকটা"।

"কিসের খওফ?"

"কেউ জানে না সাহেব। লোকটার মধ্যে নাকি কি একটা ডরাওনি খুবিঁয়া আছে, কেউ এর ওপর কোনও কথাই বলতে পারে না"।

"স্ট্রেঞ্জ, এক্সট্রিমলি স্ট্রেঞ্জ। বাট, লাশ নিয়ে করে কি লোকটা?"

"কেউ জানে না সাহেব।"

"হুমম," কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে কি ভাবেন স্লীম্যান।

"নাম কি সেই ব্রাহমিন সর্দারটির? "

কিছু একটা বলতে গিয়েও আটকে গেলো লোকটা।

তাড়া দিলেন স্লীম্যান, "বলো ফিরিঙ্গিয়া, নাম কি ওর"।

ভয়ার্ত থমথমে মুখে নামটা উচ্চারণ করে ফিরিঙ্গিয়া, ভারতের ইতিহাসে ধূর্ততম খুনীদের মধ্যে অন্যতম খুনী,

"সাহেব, ওর নাম পণ্ডিত, ঠগীদের বেতাজ বাদশা দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত"।

****
****

রাত তখন গভীর। জঙ্গলের অনেক ভেতরে একটি ছোট মজে যাওয়া খালের পাশে শবদেহটিকে ফেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামান্য হাঁফাচ্ছিলেন দুর্গাশঙ্কর। এই শবটিকে কাঁধে করে টেনে আনতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে ওঁকে। হাজার হোক, বয়েস তো হয়েছে । আর তার ওপর এই অল্পবয়সী কাহারটি যথেষ্ট ভারী।

বয়েস, কথাটা মনে পড়তেই একটা মৃদু হাসি দেখা দিলো দুর্গাশঙ্করের মুখে। সময়, আয়ু, জরতা এসব জয় করবার জন্যেই তো এত পরিশ্রম, আর পরিকল্পনা।

সময় মানে কাল, আর সে কালের অধীশ্বরী মা কালিকা। কালিকার পূজায় একাগ্র যে সাধক, তিনি লাভ করেন অনিঃশেষ দৈব সিদ্ধি, অতুল ঐশ্বর্য, অগণন সম্পদ, অপরিমিত সুখ, আর সে সব ভোগ করার জন্যে এক জরাহীন, দুঃখহীন, রোগহীন অনন্ত পরমায়ু।

আর লাভ করেন একটি অচিন্তনীয়, অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা!

অতুল ঐশ্বর্য চাই না দুর্গাশঙ্করের, এত সাধনা শুধু ওই অশ্রুতপূর্ব, অসম্ভব, অভাবনীয় ক্ষমতাটি করায়ত্ত করার জন্যেই!

বড় কঠিন, বড়ই কঠিন এ পথ, নিজের মনেই মাথা নাড়েন দুর্গাশঙ্কর। বিন্দুমাত্র পদঃস্খলনের অর্থ তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। দুর্গাশঙ্করকে কি কম কষ্ট করতে হয়েছে এতটা পথ আসতে? এ কি গ্রাম্য গৃহস্থের এতে সাধারণ মূর্তিপূজা? এই সাধনায় লাগে নিগূঢ়তম সাধন উপচার, নিশ্ছিদ্র সাধনপ্রক্রিয়া, নিবিড় মনঃসংযোগ।

আর লাগে নির্মমতম অর্ঘ্য।

আজ তেমনই এক অর্ঘ্য নিয়ে এসেছেন দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত। চেনা জঙ্গলে, চেনা মজে যাওয়া খালের ধারে, চেনা শ্মশানে।

আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে এইখানেই ছিল এক ক্ষুদ্র শ্মশান। খুঁজলে তার কিছু চিহ্ন এখনো ইতিউতি চোখে পড়বে। তখন খালে আসত ছলছল জলপ্রবাহ, তার সংযোগ ছিল রেওয়া, বা নর্মদার সঙ্গে। পার্শ্ববর্তী জনপদ থেকে দেহ সৎকার করতে যাবতীয় শবদেহ নিয়ে এখানেই আসত গ্রামের লোকজন। প্রায়ই 'রামনাম সৎ হ্যায়' ধ্বনিতে মুখরিত হতো এই ছোট শ্মশানটি। দাহকার্য সমাধা করে, খালের জলে অস্থি বিসর্জন করে, হাত পা ধুয়ে দেহাতি লোকজন ফিরে যেত চেনা সংসারবৃত্তে। কালের গতিতে ক্রমে নদীর বাঁক দিক পরিবর্তন করে। খাল মজে যায়। কমে যায় লোকজনের যাতায়াত। ধীরেধীরে জঙ্গল এগিয়ে এসে গ্রাস করে এই এলাকা। শুধু খাল যেখানে বাঁক নিয়ে নর্মদার দিকে এগিয়ে যেত এককালে, সেখানে থেকে যায় এক বিল।

দুর্গাশঙ্কর এই শ্মশানের খোঁজ পান তার গুরুর কাছে। অমিত তন্ত্রশক্তিধারী সেই বৃদ্ধসাধক নিজের প্রিয়তম শিষ্যকে এই গহীন জঙ্গল, এই শ্মশান আর চূড়ান্ত সাধনসিদ্ধির পথ চিনিয়ে দিয়ে যান;

আর বলে দিয়ে যান মহার্ঘতম উপচারটি সংগ্রহের একমাত্র উপায়টির কথা, ঠগী।

মা ভবানীর অনুরক্ত, ভারতবর্ষের ইতিহাসের দুর্ধর্ষতম, নিপুণতম, নিষ্ঠুরতম খুনীদের দল, ঠগী।

গুরুদেব ত্রিকালসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তিনিও দুর্গাশঙ্করের অভীষ্ট জেনে প্রথমে কিছুতেই সম্মত হননি তন্ত্রের এই ভয়ঙ্করতম প্রকরণটি শেখাতে। শেষে শিষ্যের নিষ্ঠা আর একাগ্রতার কাছে ওঁকে হার মানতে হয়।

সচল হয়ে ওঠেন দুর্গাশঙ্কর। অনেক কাজ বাকি। এখনই শুরু করতে হবে বাকি প্রক্রিয়া।

শ্মশানের এক প্রান্তে একটি ছোট কুঁড়েঘর। সেখান থেকে এক এক করে সমস্ত উপচার ও উপকরণ নিয়ে আসেন উনি। গাছের ডালে আবার একটি প্যাঁচা ডেকে ওঠে। বড় সুলক্ষণ, বড় সুলক্ষণ, বিড়বিড় করেন দুর্গাশঙ্কর।

শবদেহটিকে কোমর ধরে পূর্বদিকে মাথা রেখে উলটো করে শুইয়ে দেন। খুলে দেন পরণের সমস্ত কাপড়। কলসে করে জল রাখাই ছিল, এনে ধুইয়ে দেন অনাবৃত শরীর। ধীরেধীরে চন্দনে চর্চিত করেন সমস্ত দেহ, কাঁধে, পিঠে, বাহুমূলে, করতলে এঁকে নেন বিশেষ কিছু শাস্ত্রচিহ্ন।

এরপর পূর্বে গুরু, পশ্চিমে বটুক, উত্তরে যোগিনী আর দক্ষিণে গণেশকে অর্চনা করে শুরু করেন শাস্ত্রোপচার।

প্রাথমিক পূজার্চনা শেষ হলে জয় ভবানীমন্ত্রে ভূতশুদ্ধি করে, শবের মাথার নিচে এনে দেন ঘাসের শয্যা। মুখের কাছে এনে রাখেন পোড়া মাছ, ভিজানো ছোলা, আর দেশী মদ, শব জেগে ওঠার উপক্রম করলে এগুলি মুখে দিতে হবে। এরপর শবের দশদিকে বারো আঙুল পরিমাপ দূরে দূরে প্রোথিত করে দেন অশ্বত্থ গাছের শাখা। এতদন্তে শবের উপরে বসে শুরু করেন তন্ত্রের জটিলতম প্রক্রিয়া, শবসাধনা।

তারপর অনেক সময় পরে, সমস্ত রাতচরা পাখি ঘরে ফিরে এলে, ব্রাহ্মমুহূর্তের একটু আগে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত। আজকের সাধনাও সফল হয়ে হয়েছে ওঁর। পরিপূর্ণ হৃদয়ে, প্রসন্ন মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেন তিনি। আর একটি, মাত্র একটি সোপান বাকি। তারপরেই দেবাসুরেরও অনায়ত্ত সেই মহত্তম ক্ষমতাটি ওঁর মুঠোর মধ্যে! স্মিত হাসি ফুটে ওঠে দুর্গাশঙ্করের শুষ্ক অধরে। সাপের মতন সরু জিভ বার করে ঠোঁটটা চেটে নেন উনি।

একশো সাতটি শবসাধনা সম্পূর্ণ হল। আর একটি। মাত্র একটি। শেষ সাধনা। মহাভৈরব মন্ত্রে মহাকালী আর কালভৈরবের শেষ আরাধনা, তারপরেই....

পুব আকাশে লাল আভার ক্ষীণতম আভাস পাওয়ামাত্র চঞ্চল হয়ে ওঠেন দুর্গাশঙ্কর। এই শব এখানে ফেলে রাখা যাবে না, ব্রাহ্মমুহূর্তের আগেই একে নিক্ষেপ করতে হবে উদ্দিষ্ট ক্ষেত্রে। দ্রুত মৃতদেহটির পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করেন উনি।

মেঠো জঙ্গুলে পথ। দ্রুত চলন দেখে বোঝা যায় যে, এ পথে ওঁর আসা যাওয়া আছে ভালোই। শ্মশানঘাট থেকে বেশী দূরও নয়, কয়েকশো গজ গেছেন মাত্র, একটা সুঁড়িপথ ঘুরেই থেমে যান উনি। সামনে মাটির ওপর একটা গোলাকার বড় জায়গা, শুকনো ঘাসপাতা, খড় আর ঝরা নারকেল গাছের শাখা দিয়ে ঢাকা।

দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত দ্রুত অভ্যস্ত হাতে সেই সব ডালপালা সরিয়ে রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে এক বিশাল কুঁয়োর মুখ উন্মুক্ত হয়।

আর একটা প্রাচীন মড়াপচা গন্ধ ধাক্কা মারে ওঁর মুখে, ধীরেধীরে সেই ম্লান বিষণ্ণ কটু গন্ধ আশেপাশের বাতাস ভারী করে দিতে শুরু করে। দুর্গাশঙ্কর দ্রুত এই মৃতদেহটিকে কুঁয়োর মধ্যে ঠেলে দেন।

ধপ করে একটা আওয়াজ হয়।

কোনও হাহাকারের আওয়াজ পাক খেতে খেতে উঠে এলো নাকি? নাকি কোনও পুঞ্জীভূত নিষ্ফলা ক্রোধের আঁচ অব্যক্ত আক্রোশে মাথা কুটছে নিঃসীম পাতালের নিচে? গোঙানির মতন একটা চাপা কান্না মাটির দেওয়াল ধরে উঠে আসতে চাইছে না ?

ওরা সব কেমন আছে নিচে? ওরা সবাই? দুরন্ত কৌতূহল হয় দুর্গাশঙ্করের। ক্ষণেকের মানুষী দুর্বলতা গ্রাস করে নিষ্ঠুর দুর্গাশঙ্করের অন্তঃকরণকে।

জঙ্গলের মধ্যে তখনও অন্ধকার। ভালো করে কিছু দেখা যায় না। কোঁচড় থেকে চকমকি পাথর বের করে কিছু শুকনো ঘাসপাতা জ্বালান তিনি। তারপর একটি ঝাঁকরা দেখে শুষ্ক বৃক্ষশাখা জ্বালিয়ে নেন তাতে। চমৎকার মশালের মতন আলো হয়।

ধীরেধীরে সেই অন্ধগহবরের সামনে মশাল টিকে নিয়ে যান উনি।

মুহূর্তের আলোয় দেখেন অগণন মৃতদেহ শুয়ে আছে কুঁয়োর নিচে। আর কেউ না জানুক, দুর্গাশঙ্কর জানেন যে ওরা সংখ্যায় একশো সাত!

ধক করে একটা হাওয়া এসে নিভিয়ে দেয় সেই মশাল। দুর্গাশঙ্কর মা ভবানীর নাম নিয়ে কুঁয়োর মুখ ঢেকে দিতে থাকেন অভ্যস্ত হাতে।

উনি কি ঠিক দেখলেন? মুহূর্তের আলোয় মনে হলো যেন প্রতিটি মৃতদেহ একেবারে অবিকৃত, যেন সব কটিকেই গতকালই নিক্ষেপ করা হয়েছে এখানে। ঠিক দেখলেন কি? নাকি এ শুধুমাত্র শ্রান্ত স্নায়ুর মতিচ্ছন্নতা, রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে?

কোথাও একটা তক্ষক ডেকে উঠলো। উঠে দাঁড়ালেন দুর্গাশঙ্কর, পিছন ফিরে জঙ্গলের বাইরে, লাকরাদৌনের রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আরও একজোড়া পা সেই একই রাস্তা ধরলো।

চিন্তামগ্ন হওয়ার দরুন দুর্গাশঙ্কর, পিশাচসিদ্ধ দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত এই অনধিকারচর্চার খোঁজ পেলেন না!

****
****

"সাহেব"।

চিন্তার রেশ কেটে যায় স্লীম্যানের। কুঠিতে নিজের অফিসঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দূরের একটা টিলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবছিলেন।

এদেশে আসার আগে থেকেই অনেক কিছু শুনেছিলেন স্লীম্যান। হাতি, স্নেক চার্মার, রোপ ট্রিক, আর সাধু সন্ন্যাসীদের দেশ নাকি ভারতবর্ষ। শুনেছিলেন এদেশের অতুল ঐশ্বর্য আর অতিথিপরায়ণতার কথা। এসে দেখেছেন আরও অনেককিছু। দেখেছেন মুষ্টিমেয় লোকের অবিশ্বাস্য পরিমাণ ঐশ্বর্য আর বাকি ভারত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বুভুক্ষু দারিদ্র্য, অন্ধ অশিক্ষা, আর আদিম কুসংস্কার। দেখেছেন ভেঙ্গে পড়া শাসনব্যবস্থা, সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা। দেখেছেন সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একই রাস্তায় হেঁটে চলা ঠগী, ম্যাকফানসা আর ধুতুরিয়াদের, লুঠপাট আর খুনজখম করে উদরপূর্তি করাই যাদের কাজ। দেখেছেন আইন ও শাসনব্যবস্থার শোচনীয় দুরবস্থা, চারিদিকে কালো কুয়াশার মতন ছড়িয়ে থাকা ভয় আর অরাজকতার বাতাবরণ।

সামনের জমিতে থেবড়ে বসে আছে দুটি মানুষ। উর্ধাঙ্গে একটা নোংরা ফতুয়া পরণে, ততোধিক নোংরা একটা ধুতি নিম্নাঙ্গে, হাঁটুর ওপর অবধি গোটানো। গালে অনেকদিনের না কামানো দাড়ি, ধূলিধূসরিত পা। দুজনেরই দুচোখে একটা উদাস শান্ত সমাহিত দৃষ্টি, হঠাৎ করে দেখলে সাধুমহাত্মা বলে ভুল হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

এবং এই দুজনকে বাদ দিয়ে শুধু স্লীম্যান, একমাত্র স্লীম্যানই জানেন যে এই দুজনের শিরা ওঠা হাতগুলির ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে লেখা আছে কোন ভয়ঙ্করতম ইতিহাস। সাতশো থেকে আটশো, স্লীম্যান নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না, তবে ওর মধ্যেই হবে, প্রায় এতগুলো মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, বিস্ফারিত চোখে, সামনের দিকে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চেয়ে ছটফট করতে করতে মরেছে, তার পর চিরঘুমে শায়িত হয়েছে কোনও না কোনও কবরের তলায়, বিস্তীর্ণ মধ্যভারত জুড়ে! এই দুইজোড়া হাতের দৌলতে।

তোপের মুখে বেঁধে দুটোকেই উড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। ইংল্যান্ড হলে সেই হুকুমই দিতেন স্লীম্যান, মধ্যভারতে কম্পানির প্রতিনিধি উইলিয়াম হেনরি স্লীম্যান। কিন্তু এই লোকগুলোকে ওঁর চাই। নইলে মাকড়সার জালের মতন সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে থাকা এই অত্যন্ত গুপ্ত খুনি সংগঠনটিকে উনি টেনে তুলতে পারবেন না। ওঁর একটা প্রবেশসূত্র দরকার, একটা ছোট ছিদ্র, তারপরেই..

"বলো ফিরিঙ্গিয়া, কি বলছিলে। দোস্তকে নাস্তাপানি করিয়েছ?"

"জি সাহেব।"

"বলো, তোমার দোস্ত কি বলতে চায়। প্রথম থেকে বলতে বলো। কি নাম তোমার?"

আরেকজন নড়েচড়ে বসে, সেলাম করে, ঘরঘরে গলায় নিজের নাম বলে।

প্রথমে ঠিক করে নামটা শুনতে পাননি স্লীম্যান, ভুরু কুঁচকে একটু এগিয়ে আসেন,

"খোদাবক্স, সাহিব", গলাটা খাঁকার দিয়ে পরিষ্কার করে নেয় আগন্তুক, " বান্দার নাম খোদাবক্স। সাকিন নৈনপুরের কাছে জেওনারা গাঁও। আমি একজন ঠগী হুজৌর, ভুকোত জমাদারের দলের। কামকাজ ভালোই চলছিল হুজুর, মা ভবানীর দোয়াতে। হাসিখুশি ছিলাম সবাই, ভাইবেরাদরের মতন। কিন্তু হুজুর আজ থেকে তিন সাল পেহলে...."

দুনিয়া ভুলে এই লোকটির কাছে আরও নিবিড় হয়ে ঘেঁষে বসেন স্লীম্যান। ভ্রূকুটিকুটিল, কিন্তু উজ্জ্বল চোখে।

শেষ পর্যন্ত অচিন পাখির খোঁজ পাওয়া গেলো!

****
****

সকালটা শুরু হয়েছিল আর পাঁচটা সকালের মতনই। দলের নাউরিয়া বাবুনিয়া দুসাদ সবাইকে ডেকে ডেকে দিচ্ছিল। দলের নতুন নাউরিয়াদের কাজই হলো এইসব বেকার খিদমৎ খাটা, আসল কাজ শেখাবার নামই নেই, অসন্তুষ্ট মুখে বিড়বিড় করছিল বাবুনিয়া। তবে জায়গাটা খাসা, কারও সন্দেহের কোনও কারণই থাকবে না। খিজিরপুরের কাস্টমস হৌসের একটু দূরে একটা বড় আমবাগানের মধ্যেই ডেরাডাণ্ডা বেঁধেছিল দলের সবাই, ঠাকুর যেমনটি বলে দিয়েছিলেন! কম্পানির ছত্রছায়ায় বসে থাকার সুবিধাও অবশ্য অনেক, বেকার হ্যাঙ্গামহুজ্জোত এড়ানো যায় সহজেই।

খোদাবক্স ফিরেছিল একটু ভোররাতের দিকেই। ঘুমও আসে না ছাই এই অসময়ে, তাই ফতুয়াটা খুলে তাকিয়া মতন করে মাথার নিচে দিয়ে একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছিল আর কি! এমন সময়ে মুখের ওপর কোন বেওকুফের ছায়া পড়লো কে জানে? খোদাবক্স আধবোজা চোখটা বিরক্তির সঙ্গে খুলেই দেখে ঠাকুর!

ধড়মড় করে উঠেই বসছিল খোদাবক্স, ঠাকুর ইশারায় উঠতে বারণ করেন। নিজেই ধপ করে বসে পড়েন পাশে।

"খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে খোদাবক্স। তবিয়ৎ শরিফ তো? গেছিলে কোথায় ? অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে মনে হচ্ছে, বলি দোস্তের বাড়ির সব খবর ভালো তো? "

সতর্ক হয় খোদাবক্স। এই হ্যায়ওয়ান বরাস্তনটার কাছে বেশী মুখ খোলা যাবে না আর। এইসব ভালো ভালো প্রশ্নের মানেই হচ্ছে পাক্কা কিছু সন্দেহ করেছে শয়তানটা। মুখৌটা পরে থাকতে হবে, হরহামেশা। যদ্দিন না...

"হাঁ ঠাকুর। অনেকটা আসতে হয়েছে হেঁটে, রাস্তা কি কম? সেই খুরাই থেকে রাত থাকতেই রওয়ানা দিয়েছি, সকাল সকাল দলের সঙ্গে মোলাকাত করতে হবে যে! আর হ্যাঁ, আপনার দোয়াতে দোস্ত আর ওর জরু ভালোই আছে। ফসল ভালোই হয়েছে এবার। নতুন বলদ কিনেছে দুটো, নানহিমুনহি একটা বেটিও হয়েছে ওদের"।

"বেটি?" একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান ঠাকুর, "বেটি বললে নাকি?"

একটু ঘাবড়ে যায় খোদাবক্স, ভুল কিছু বলল নাকি? নাকি বেটা বললেই সুবিধা হতো?

"হাঁ ঠাকুর। খুব প্যায়ারি একটা বিটিয়া রানি হয়েছে ওর। বেটি খুব হাসমুখ, সবসময় খিলখিল করছে", সতর্ক হয়ে বলে খোদাবক্স।

"বেটি? বাহ, খুব ভালো। খুব গোলমাটোল হয়েছে নিশ্চয়ই? খুব গোরি? খুব হাসে বলছো? খুব প্যায়ারি হয়েছে?"

খোদাবক্স একটু ঘাবড়ে যায়। এসব প্রশ্নের উত্তর মোটেই তৈরি করে আসেনি সে। সিলম্যান সাহিবও এসব বলে দেননি যে!!

এই উৎকন্ঠা থেকে ত্রাণ করলেন ঠাকুর নিজেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে গেলেন।

খোদাবক্সকে বিমূঢ় রেখে!

****
****

সগরের কম্পানিকুঠিতে সেদিন সকাল থেকেই সাজো সাজো রব। কলকাতা থেকে খোদ ফিরঙ্গ সেপাই এসেছে পঞ্চাশজন মতন। কি তাগড়াই শরীর তাদের, কি ভাবলেশহীন মুখ, আর কি কুচকাওয়াজের বহর। তার ওপর বড় বড় বন্দুক এক একজনের কাঁধে। সরু চোখে এসব দেখে যাচ্ছিল ফিরিঙ্গিয়া, আর ভাবছিল এই আদব, এই আরাস্তাগি আছে বলেই না এই ফিরঙ্গরা এত বড় হিন্দুস্তানে থানা গেড়ে বসেছে!

প্রাক্তন ঠগী, বেহরামের পর দুর্ধর্ষতম ঠগী ফিরিঙ্গিয়া একটু ম্লান হাসি হাসলো। সব এদের অধিকারে যাবে। সমস্ত হিন্দুস্তান লাল হয়ে যাবে। এই ফৌজ একদিন দিল্লি থেকে কালিকট, নাগপুর থেকে কলকাত্তা দাপিয়ে বেড়াবে। দুর্বল হিন্দুস্তান চেয়ে চেয়ে দেখবে শুধু।

ভালোই হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরিঙ্গিয়া। এখনই কি খুব ভালো আছে দেশ ? চোর জোচ্চর বাটপাড়ে যে ভরে গেলো সব। লাখনৌ আর দিল্লিতে পুরানি খানদানি নওয়াব আর কলকাত্তায় নয়া বড়লোকদের বাবুয়ানি ছাড়া বাকি দেশে কানুনি হুকুমত আছে

কিছু? ফিরিঙ্গিয়ারা না হয় ঠগী, মা ভবানীর আদেশ ছাড়া মানুষ খুন করে না, শাস্ত্রের আদেশ ছাড়া কাসসি তে হাত অবধি ছোঁয়ায় না, বাকিরা? ধুতুরিয়ারা? ম্যাকফানসারা? ভাঙ্গিরা? ছোটখাটো জমিন্দারেরা? এক এক জন তো সাক্ষাৎ নরপিশাচ। গাঁয়ের খুনে তহশিলদার ছোটে সিং তোমর ওর ঘরে আগুন লাগিয়ে সব ছারখার করে না দিলে কি আজ ফিরিঙ্গিয়া এই রাস্তায় নামত?

চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিল ফিরিঙ্গিয়া, পাশে স্লীম্যান এসে দাঁড়াতে হোঁশ ফিরে পায়।

"কোই হুকুম মেরে লিয়ে, সাহেব?"

"শুধু রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেই হবে। তোমার দোস্ত চিনতে পারবে তো?"

"বেশক হুজুর, খোদবক্স খুবই হোঁশিয়ার লোক। আন্ধেরাতেও বিলকুল সাফ দেখে। বিলকুল চিন্তা না করে সাহেব"।

"বেশ বেশ। আর আজকেই হবে তো ব্যাপারটা? তুমি নিশ্চিত?"

"হ্যাঁ, সাহেব", পিছন থেকে আওয়াজ আসে, "আমার গণনা যদি ঠিক হয়, আর পণ্ডিতজি যা করছেন বলে খবর পেয়েছি তা যদি সাচ্চা হয়, আজই সেই দিন, শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। মকরে শনি প্রবেশ করবেন আজ রাতে, কালভৈরবের পূজার জন্যে এর থেকে ভালো দিন পণ্ডিতজি আর পরের পঞ্চাশ বছরেও পাবেন না "।

ঘুরে দাঁড়ান স্লীম্যান। এতক্ষণ ধরে পাশের একটা ঘরে ওল্ড কিছু স্ক্রিপচার্স নিয়ে কিসব করছিল এই ব্রাহমিন। ফিরিঙ্গিয়া দেখেই মাটিতে শুয়ে পড়ে, "গোর লাগি ঠাকুর"।

অনেক খুঁজেপেতে একে নিয়ে এসেছেন স্লীম্যান। এই দেশের ব্ল্যাক ম্যাজিক আর রিচুয়ালসের কিছুই বোঝেননা তিনি। তাই দরকার ছিল এমন একজনের যে পুরো ব্যাপারটা বুঝে একটা ওয়ে আউট বলে দেবে। এই ডার্ক ব্রাউন কালারের, শর্ট হাইটের ব্রাহমিনটি বেঙ্গলের লোক, নর্মদার তীরে ফেমাস শিভা টেম্পলে পিলগ্রিমেজ সেরে ফিরে যাচ্ছিল। ফিরিঙ্গিয়াই খোঁজ আনে এই লোকটার। খুবই নাকি পাওয়ারফুল ব্রাহমিন এ, আর একটা কিসে যেন খুব ফেমাস....কি যেন যেন....ইয়েস, তান্ত্রা!!

"তুমি ঠিক বলছ ঠাকুর?", একটু সন্দেহই যেন প্রকাশ পায় স্লীম্যানের গলায়।

মৃদু হাসেন সেই ব্রাহ্মণবটু, "আমার গণনা কখনো ভুল হয়না সাহেব। তোমরা যা বললে, সব শুনে মনে হচ্ছে আজই সেই দিন। আর যদি দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত এই সাধনায় সফল হন, মহা অনর্থ হয়ে যাবে সাহেব," চোখ বুজে শিউড়ে উঠলেন তিনি।

"কিসের অনর্থ ঠাকুর?" কৌতূহলী হয়ে ওঠেন স্লীম্যান।

"তুমি বুঝবে না সাহেব। আমার জ্ঞানমতে গত পাঁচশো বছরের মধ্যে এই সাধনপথে এগোবার সাহস করেনি কেউ। শবসাধনা বোঝ সাহেব? একটি সদ্যমৃত লাশ নিয়ে

সারারাত একা নির্জন শ্মশানে বসে ভয়ঙ্কর সাধনা। অনেক তান্ত্রিকের জীবনে একবারও শবসাধনা করার সৌভাগ্য হয় না। আর ইনি একের পর এক শবসাধনা করে চলেছেন....এর একটাই মানে হয়...", চিন্তিত হয়ে পড়েন সেই খর্বকায় ব্রাহ্মণ, "আর যদি তাই হয়, পণ্ডিতজিকে আটকানো জরুরি, খুব জরুরি। ভগবান না করুন, আজই যদি একশো আটতম সাধনা পূর্ণ হয়.... " বলে ফের শিউড়ে উঠলেন তিনি, হাতদুটো বুকের মধ্যে রেখে বিড়বিড় করে ইষ্টনাম স্মরণ করেন তিনি।

একশো আট? মুহূর্তের মধ্যে আঁতকে ওঠেন স্লীম্যান, বুকে দ্রুত ক্রুশচিহ্ন আঁকেন, "মাই গুডনেস। কি বলছো কি ঠাকুর?? আর যদি দুর্গাশঙ্কর সাক্সেসফুল হয়ে যায়, তাহলে কি হবে ঠাকুর? বললে না যে? "

"নিজের ইচ্ছেমতন একজন মৃত মানুষকে ফের বাঁচিয়ে পৃথিবীতে ফেরত আনতে পারবেন উনি। বুঝে দেখো সাহেব, এ কত বড় ক্ষমতা!!! খুবই গূঢ় তন্ত্রসাধনা এই কালভৈরবপূজা, অতি অল্পসংখ্যক লোকই জানে। কেউ প্রয়োগ করার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবে না। উনি যে শুধু ভেবেছেন তাই নয়, নির্ভুল লক্ষ্যে মাপা ছক কেটে এগিয়েছেন, সহজে লাশ পাবেন বলে ঠগীদের দলেও ভিড়েছেন। বহুদিনের পরিকল্পনা আর অলৌকিক শক্তি ছাড়া এসব হয় না সাহেব। যেভাবে ভুকোত জমাদারকে বশ করেছেন বলে শুনলাম, উচ্চকোটির পিশাচসিদ্ধ না হলে এ ক্ষমতা সম্ভব নয়"।

একটু ইতস্তত করেন স্লীম্যান, "যদি তোমার কথা সত্যি ধরে নিই ঠাকুর, যদি সত্যি দুর্গাশঙ্কর একজন কাউকে বাঁচিয়ে তোলে, তাতে কি অনর্থ হতে পারে?"

"কি বলছো সাহেব? এর মানে জানো তুমি? জন্মমৃত্যু হল প্রকৃতির বিধান। বিধাতাপুরুষেরও হাত নেই এর ওপর। এ নিয়ম উলটে দিলে প্রকৃতির রুদ্ররোষ আছড়ে পড়বে দুনিয়ার ওপর। হাজার হাজার লোক ফৌত হয়ে যাবে, খরা বন্যা মহামারীতে জনবসতি উজাড় হয়ে যাবে। নদীতে জলের বদলে রক্ত বইবে, ক্ষেতের ফসল, গাছপালা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাবে, পাতাল থেকে দলে দলে উঠে আসবে নরকের মূর্তিমান পাপ। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা প্রেতভোগ্যা হবে। প্রকৃতিদেবীর ক্রোধ বড় ভয়ানক সাহেব, কারও রেহাই মিলবে না"।

ভুরু কুঁচকে শুনছিলেন স্লীম্যান। এসব সুপারস্টিশানে ওঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। কিন্তু দুর্গাশঙ্করকে আটকানোটা সবচেয়ে জরুরি। এই আঘাত ঠগীরা সহ্য করতে পারবে না। এরা ক্ষিপ্র, নৃশংস আর দুর্ধর্ষ বটে, কিন্তু সেই পরিমাণে কুসংস্কারগ্রস্ত। অনেকটাই ঠাণ্ডা করে এনেছেন এদের স্লীম্যান। একবার যদি রটে যায় যে দুর্গাশঙ্কর ধরা পড়েছে, অতবড় তান্ত্রিকও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি কম্পানির হাত থেকে, ঠগীদের মনোবল বলে আর কিছু থাকবে না। এই সুযোগটাই স্লীম্যান খুঁজছিলেন অনেকদিন ধরে। চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে ওঁর। এই সুযোগ ফসকে যেতে দেওয়া যাবে না, কিছুতেই না।

"কোনও উপায় ঠাকুর? এই শয়তানটাকে আটকাবার কোন উপায়? "

"নেই বললেই চলে। এই পণ্ডিত এখনই অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী। সমস্ত উদ্যোগ হেলায় বানচাল করে দিতে পারে। চেষ্টা করাটাই শুধু আমাদের হাতে সাহেব। ঈশ্বর যা

চান তাই হবে, চাইলে কি আমরা আটকাতে পারবো?"

"আচ্ছা? ঠিক আছে দেখা যাক কে জেতে, কম্পানির বন্দুক না তোমাদের এইসব তান্ত্রা অ্যান্ড অল", এই বলে চোখ মেরে মুচকি হাসেন স্লীম্যান।

হেসে ফেলেন ব্রাহ্মণটি, " ভালো কাজে নেমেছো সাহেব। এদেশের রাজামহারাজারা তো আর আইনের শাসন, প্রজাদের জানপ্রাণ, ভালোমন্দ এসব নিয়ে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত নয়, খাজনা আদায় করেই কর্তব্য শেষ মনে করে। তোমরা বিদেশিরা যে নিজেদের জন্যে হলেও এইসব গুণ্ডাবদমাশদের ঠাণ্ডা করতে নেমেছো, এই দেখে আমি প্রাণভরে আশির্বাদ করলাম। ভয় পেও না। মনে রাখবে মানুষকে ভালোবাসার কাছে সমস্ত অশুভ পূজামন্ত্র ব্যর্থ। ভালোবাসা হল সবচেয়ে বড় তন্ত্র, সবচেয়ে বড় যাদু।"

বেরিয়ে যাবার জন্যে পুঁতিপত্র গোটাচ্ছিলেন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণটি। স্লীম্যান কাছে গিয়ে দাঁড়ান, "তোমার নাম বলে গেলে না ঠাকুর?"

উঠে দাঁড়ান ব্রাহ্মণবটু, দুচোখে কৌতুক খেলে যায়, চোখ মেরে মুচকি হাসেন " আমার নাম উচ্চারণ করতে গেলে তোমার দুটো জিভ লাগবে সাহেব। খুব খটোমটো নাম আমার"।

হো হো করে হেসে ওঠেন স্লীম্যান, হাসি থামলে বলেন, " আচ্ছা বলো তো একবার, দেখি উচ্চারণ করতে পারি কি না"।

"আমার নাম কৃষ্ণানন্দ সাহেব, পুরো নাম কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ"।

****
****

সুবন হরসুকা সত্যিই ক্ষণজন্মা তিলহাই। গতকালই খবর এনেছিল যে এক নিয়ামতে ভিটু, অর্থাৎ ধনী হিন্দু বানিয়া এদিকেই আসছে লটবহর নিয়ে। বানিয়া নিজে, দু চারটি খিদমতগার আর একটি বছর আট দশেকের খোনতুরি, এ ছাড়া আর কেউ নেই সঙ্গে।

ভালোই হল, সুবন ভাবে, দুমাইল দূরেই ঝুরকো ডোঙ্গির ডেরা, এই এলাকার মশহুর ব্রিনজার, বাচ্চা মেয়েটাকে বিক্রি করেও ভালো টাকা পাওয়া যাবে। এক ঢিলে দুই পাখি। এও খবর আছে যে এই বানিয়া, বনোয়ারিলাল, সঙ্গে বেশ কিছু টাকাপয়সা নিয়ে নিজের সসুরাল যাচ্ছে, পুরনো কিছু উধার চুকাবার আছে বলে। এক রাতের রাস্তা ভেবে বেশী লোকজনও সঙ্গে নেয় নি বেওকুফটা।

ভালোই, সুবন ভাবে। বেশী হাঙ্গামা হবে না। অল্প পরিশ্রম, বেশী লাভ।

ঠাকুর অবশ্য আজ ঝিরণী দেওয়ার সময় থাকবেন না। ওঁর নাকি বিশেষ কিছু কাজ

আছে। ঝিরণীর পরেই আসবেন। তাতে অসুবিধা কিছু নেই। উনি নিজের 'প্রাপ্য'টুকু বুঝে নিয়ে যাবেন, এতে কার কি বলার আছে? প্রাপ্যটিও তো তেমন বিশেষ কিছু নয়, তবে কিনা বনোয়ারিলাল বেশ নাদুসনুদুস ইনসান বটে, ঠাকুরের বেশ কষ্টই হবে একে টেনে নিয়ে যেতে, ফিকফিক করে হাসতে হাসতে ভাবে সুবন।

"একলা একলা এত হাসি কিসের রে সুবনা?" পেছন থেকে মোরাদুন জিজ্ঞেস করে, ধাউড় জমাদারও সঙ্গেই ছিল, "আরেকটা শাদি করার খোয়াব দেখেছিস নাকি কাল রাতে?"

ফিক করে হেসে ফেলে সুবন, "না ভাইয়া, ভাবছি যে বানিয়াটা আজ ভবানী মাঈয়ের প্রসাদ হবে, তার কথা। ঘিউ দুধ খেয়ে যা বিশাল শরীর বানিয়েছে না, গর্দন তো বোঝাই যায় না, খোদাবক্স ভাইজান পেলহুটা কোথায় পড়াবে তাই ভাবছি, হি হি '।

মোরাদুন আর ধাউড়ও হেসে ফেলে। এরা দুজনেই দক্ষ সোথা। শিকারের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ভুলিয়েভালিয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করাই এদের কাজ। এই কাজে গোটা বেহড়ে এদের থেকে নামজাদা লোক আর নেই।

তা সে নামের প্রতি সুবিচার করেই বোকা বানিয়াটির ছোট বহরটিকে লাকরাদৌনের আশেপাশে তাঁবু ফেলাতে বেশী কসরত করতে হোল না ওদের কাউকেই।

পাঁচটি পুরুষ আর একটি নিষ্পাপ বালিকাকে ঘিরে আনন্দ হাসি ঠাট্টার মৃত্যুবাসর বসালো প্রায় চল্লিশটি হিংস্র শ্বাপদ!

****
****

কাল থেকেই ব্যস্ত ছিলেন দুর্গাশঙ্কর। জন্মের শোধের শেষ সাধনা আজ। গত হাজার বছরেও এই পূজা করার সাহস কেউ করেনি, আগামী হাজার বছরেও কেউ করবে না, স্থির নিশ্চিত উনি। গত তিরিশ বছর ধরে তিলতিল করে জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সম্বল একত্রিত করে আজকের দিনটির জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন তিনি। ন্যায় অন্যায় বোধ বিসর্জন দিয়েছেন, শাস্ত্রাজ্ঞা উপেক্ষা করেছেন অমিত তন্ত্রজ্ঞানের জোরে, দয়ামায়ার যাবতীয় বোধ পুড়িয়ে ফেলেছেন নিজেই। সমস্ত বাধাবিঘ্ন, অন্তরাত্মার নিষেধ দুপায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে গেছেন অভীষ্ট সাধনের দিকে। আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

তিরিশ বছর হারিয়ে যাওয়া একটি মুখ আবার দেখতে পাবেন বলে সর্বস্বপণ করে বিধাতাপুরুষের বিরুদ্ধে এই খেলায় নেমেছিলেন দুর্গাশঙ্কর। আজ সেই খেলার শেষ দান। দুনিয়াশুদ্ধ সবকিছু তুচ্ছজ্ঞান করে, নিজের অস্তিত্বের সব কিছু স্পর্ধাভরে বাজি রেখে জীবনের যে জুয়াখেলায় নেমেছিলে দুর্গাশঙ্কর, আজ সেই বাজি জিতে নেবার দিন। অতুল তন্ত্রতেজে বলীয়ান হয়ে এই ক্রুর নির্দয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে শোধ তোলবার দিন।

আজ কোন ভুলচুক বরদাস্ত করার প্রশ্নই ওঠে না। গত বেশ কয়েকবছর ধরে জোগাড় করা দুষ্প্রাপ্যতম পূজোপকরণগুলি একত্রিত করেছেন আজকে সকাল থেকে। সমস্ত কিছু সেই শ্মশানের পাশের কুঁড়েঘরটিতে গুছিয়ে রেখে, সমস্ত আয়োজন অনুপুঙ্খরূপে একবার দেখে করে ইষ্টস্মরণ করলেন উনি।

সব সাজাতে সাজাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল, এইবার বেরোতে যাবেন, এমন সময়ে শ্মশানের সামনের সুঁড়িপথের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেলেন দুর্গাশঙ্কর।

একশোগজ দূরে বাঁদিক থেকে ডানদিকে রাস্তা পার হচ্ছে এক বিশালদেহী সাপ, যার গায়ের খয়েরী কালো আঁশে পড়ন্ত রৌদ্রের শেষ আলো বিচ্ছুরিত হয়ে এক মায়াবী বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। একবার থমকে দাঁড়ালো সেই মহাসর্প। মাথা উঁচু করে কালো চোখ দুটি দিয়ে স্থিরভাবে দুর্গাশঙ্করকে একবার দেখে নিয়ে দীর্ঘ চেরা লকলকে জিভটি বারে দুয়েক বার করে তারপর মাথা নামিয়ে আবার ধীরেসুস্থে চলতে লাগলো।

শঙ্খচূড়। বিষধর সাপেদের রাজা। রাজার মতই চলন বটে। কি আভিজাত্য, কি দার্ঢ্য, চেয়ে দেখবার মতন।

কিন্তু সে জন্যে জঙ্গলাকীর্ণ ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে চষে ফেলা দুর্গাশঙ্কর বিচলিত হলেন না। হলেন এই জন্যে যে তন্ত্রসাধনায় ব্রতী হবার আগে এটি একটি অত্যন্ত দুর্লক্ষণ। যদিও এসব ছোটখাটো বাধা নিষ্প্রভাব করা ওঁর কাছে কিছুই না। তবুও মহাযজ্ঞের আগে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগলো।

দ্রুত চলতে লাগলেন দুর্গাশঙ্কর। কিছু তন্ত্রাভ্যাসের ফলে অস্বাভাবিক দ্রুত চলতে পারেন তিনি, একটু দূর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন কেউ উড়ে চলেছে। খবর পেয়েছেন যে এইবার থাপ বা তাঁবু কোথায় পড়েছে।

এমন সময়ে, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, স্পষ্ট শুনতে পেলেন কাছেই কোন গাছের ডালে ঘুঘু ডাকছে।

মুহূর্তের মধ্যে গতি শ্লথ হয়ে এল। রাত্রিবেলা ঘুঘুর ডাক শাস্ত্রোক্ত দুর্লক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম। ধীরেধীরে থেমে গেলেন।

কি হচ্ছে এসব? আজই কেন? একশো সাতটি শবসাধনা সুসম্পন্ন করেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই ওঁর তুল্য পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক এ দেশে আর নেই। বাকি আর মাত্র একটি, মাত্র একটি। জীবনের জুয়াখেলায় আজই তো শেষদানে সবকিছু একলপ্তে জিতে নেবার দিন। আর আজই এইসব দুর্লক্ষণ কেন? আজই কেন?

মনকে শক্ত করেন উনি। এইসব ছোটখাটো বিঘ্ন এড়াবার অজস্র উপায় উনি জানেন, এগুলি তন্ত্রসাধনার অতি নিম্নস্তরের শিক্ষা। কিন্তু তবুও, আজ এই শেষ বিজয়ের লগ্নে এইসব দুর্লক্ষণ ওঁর মনকে অজানিতেই দুর্বল করে দিচ্ছিল। আজই কেন? এতদিন তো নির্বিঘ্নেই সব কিছু সুসম্পন্ন হয়ে এসেছে। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো দুর্গাশঙ্করের।

থামলে চলবে না। লগ্ন বয়ে যায়। শনি মকরে থাকতে থাকতে সেরে ফেলতে হবে সব কিছু, মায় শবদেহটিকে সেই প্রাচীন কুঁয়োটিতে বিসর্জনের কাজটি অবধি।

আর যদি, ঈশ্বর না করুন, কোন অলৌকিক প্রকরণে আজকের এই সাধনা শেষ না করতে পারেন দুর্গাশঙ্কর? তবে?

সেই পরিণতি ভাবতেও ঘাম ছুটে গেলো ওঁর। শাস্ত্রানুসারে, যে শবসাধনার সংকল্প করে তান্ত্রিক ব্রতী হন, সেই শবসাধনা সম্পূর্ণ না করলে তদবদি সাধিত শবেদের অতৃপ্ত আত্মারা ভয়ঙ্করতম শোধ নেয় তান্ত্রিকের ওপর!!! আর সেই প্রতিশোধ আটকাবার ক্ষমতা স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবেরও নেই!!!

এই সব ভাবতে ভাবতে হাঁটার সময় খেয়াল করেননি দুর্গাশঙ্কর। একটু দূরে জঙ্গলে মধ্যে আলো দেখে হুঁশে এলেন। একদম কাছাকাছি এসে পড়েছেন। ছোট্ট তাঁবুটির মধ্যে আলো, হাসি গান ঠাট্টার দমক ভেসে আসছে। তাঁবুর বাইরেও কয়েকজন অন্ধকারে মিশে আছে। পিশাচসিদ্ধ দুর্গাশঙ্কর অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পান, তাই দেখলেন যে এরা ওঁর নিজের দলেরই সদস্য। ঝিরনীর অপেক্ষা করছে। দুএকজন বনোয়ারিলালের ঘোড়াটার পরিচর্যা করছে।

দাঁড়িয়ে গেলেন উনি। ঝিরনীর একটু পরেই ঢুকবেন না হয়। এখন অচেনা মানুষ হুট করে ঢুকে পড়ে গোল বাঁধাবার কোন মানেই হয় না।

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন দুর্গাশঙ্কর, নিবাত নিষ্কম্প কৃষ্ণবর্ণ দীপশিখাটির মতন। স্থির, অচঞ্চল, একাগ্র, দৃঢ়সংকল্প। এই দীপশিখায় আলো নেই। শুধু স্বার্থসাধনের ক্রূর ঘনকৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষাটি আছে!

হঠাৎ কেমন যেন মনে হল ওঁর, তাঁবুর ওইপারেও কতগুলি ছায়া যেন একবার নড়েই স্থির হয়ে গেলো না?

ঠিক দেখলেন? নাকি দৃষ্টিবিভ্রম?

মনটা বড় দুর্বল আর অশান্ত হয়ে হয়ে আছে সন্ধ্যে থেকেই। বার বার চিত্তবিক্ষেপ হচ্ছে, না হলে দৃষ্টিসীমার মধ্যে কে কোথায় কি করছে সে কথা দুর্গাশঙ্কর মুহূর্তে বলে দিতে পারেন। মনঃসংযোগ না করলে চিত্তপটে কিছুই উদ্ভাসিত হয় না। আর আজ...

কিছুক্ষণ ভ্রুকুঞ্চন করে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন উনি। সব স্থির। নাঃ, বোধহয় রেকলান বা শিয়াল টিয়াল হবে।

ক্ষণমুহূর্তের মধ্যে তাঁবু থেকে কে উঁচু গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, "সাহেব খান, তামাকু লাও"।

তাঁবুর ভিতরে আলোছায়ার মধ্যে কতগুলি প্রাণীর ছটফট দেখতে পাচ্ছিলেন দুর্গাশঙ্কর।

প্রত্যেকের পিছন থেকে একজন করে ঠগী গলায় পরিয়ে দিয়েছে কালান্তক পেলহু। প্রতিটি শিকারের পা দুটো ধরে আছে একেকজন চুমিয়া, যাতে ছটফট না করতে পারে শিকার, শিকারের হাতদুটি ধরে আছে একেকজন চুমোসিয়া, যাতে হতভাগ্য মানুষটি বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ না গড়ে তুলতে পারে!! এর সঙ্গে প্রধান ঘাতক যে পেলহুধারী ঠগী, ওদের ভাষায় ভুরকুত, সে হাঁটু দিয়ে ক্রমাগত শিরদাঁড়ায় চাপ দিতে থাকে, যাতে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়!

এসব মৃত্যুনাটিকা অনেক দেখেছেন দুর্গাশঙ্কর। এসব ওঁকে বিচলিত করে না আর অনেক আগে থেকেই।

শব পাওয়া নিয়ে কথা।

সাধনা শেষ করা নিয়ে কথা।

সেই চাঁদমুখটি আবার বুকের মধ্যে পিষতে পারার আনন্দ নিয়ে কথা।

আজ পৃথিবী জানবে এক বাবা তার মৃত মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্যে কি কি করতে পারে!

শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ মাথার ওপর প্রায়। অপার্থিব জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে বিশ্বচরাচর। সামনে ছায়ার মতন এক ছোট তাঁবুতে অভিনীত হচ্ছে এক অসহায় মৃত্যুনাটিকার ইতিকথা। নির্বাক নিরাসক্ত দর্শক হয়ে দেখছেন দুর্গাশঙ্কর। দেখছে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আরও বেশ কয়েকজন মৃত্যুব্যবসায়ী ঠগীও। হাওয়াও বইছে না একটুও, প্রতিটি গাছের পাতা স্থির। তাঁবু থেকে ভেসে আসা হাঁচোরপাঁচোরের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দও নেই।

এমন সময়ে দিগবিদিক সচকিত করে ভেসে এলো এক অপার্থিব আর্তনাদ, "বাপু, কোথায় তুমি? আমার খুব কষ্ট হচ্ছে"!

এক মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কে আর দিশেহারাভাবে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন দুর্গাশঙ্কর!!!

সেই গলা, সেই ডাক, সেই আকুতি, যেন ত্রিশ বছর আগেকার এক শাপগ্রস্ত গ্রামের আগুনে পুড়ে যাওয়া সন্ধ্যে থেকে উঠে এসে দুর্গাশঙ্করের বুকে দীর্ঘ ভল্লার মতই বিঁধে দিলো!!!

"মুন্নিইইইই" বলে শাপগ্রস্ত পিশাচের মতন তাঁবুর দিকে উন্মাদের মতন ছুটে চললেন দুর্গাশঙ্কর।

ত্রিশ বছর আগে হেরে গেছিলেন। আজ নয়, আজ নয়, আজ কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়। এর জন্যেই, এর জন্যেই এত সব কিছু...

উন্মাদের মত ছুটে চললেন দুর্গাশঙ্কর।

****
****

জঙ্গলের মধ্যে পঞ্চাশ জনের ব্রিটিশ আর্মি, দশজন দেশি সিপাই, ফিরিঙ্গিয়া আর খোদাবক্সকে নিয়ে থাপ বা তাঁবুর কাছেই স্থির দাঁড়িয়ে ছিলেন স্লীম্যান।

শঙ্কা আর কর্তব্যের দোলাচলে দুলছিলেন স্লীম্যান। আজ যদি দুর্গাশঙ্কর ধরা পড়ে, ঠগীদের নির্মূল করাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর যদি না ধরা পড়ে? সত্যিই যদি অকাল্ট পাওয়ার বলে কিছু থাকে? সৈনিক তিনি, নিজের জন্যে ভাবেন না। কিন্তু এমিলি?

একটু দূরেই টেন্টটা দেখা যাচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে যে হুল্লোড় চলছে খুবই। শরীরটা টানটান হয়ে উঠলো স্লীম্যানের। শুনেছেন যে এটাই সেই সময়। যে কোন মুহূর্তে ঝিরণী উঠতে পারে। শিকারী বাঘের মতন তীক্ষ্ণ স্নায়ু আর পেশী নিয়ে সতর্ক হলেন উনি। সুশিক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যদল নিঃস্পন্দ রইলো। দেশী সিপাই, খোদাবক্স আর ফিরিঙ্গিয়াও এই স্তব্ধ জ্যোৎস্নার মাঝে অজানা আশঙ্কায় শ্বাস অবধি বন্ধ করে রইল।

যেন এক আসন্ন মূর্তিমান অমঙ্গলের ছায়া চারিদিকে!

এমন সময়ে সেই স্তব্ধতা খানখান করে অমোঘ মৃত্যু পরোয়ানা নেমে এলো শিকারী বাজের মতই, "সাহেব খান, তামাকু লাও"।

দৌড়েই যাচ্ছিলেন স্লীম্যান, পিছন থেকে খোদাবক্সের হাত টেনে ধরে। এখন নয়, মনে পড়ে যায় স্লীম্যানের, আজকে দুর্গাশঙ্কর ঝিরনী দেওয়ার পর ঢুকবেন। অতএব আরও খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায় নেই। দাঁতে দাঁত চিপে চাঁদনি রাতের শিল্যুয়েটে তাঁবুর মধ্যেকার অসহায় মানুষগুলির ছটফটানি দেখছিলেন স্লীম্যান। দুরন্ত অসহায় ক্রোধে শপথ নেন স্লীম্যান, হয় দুর্গাশঙ্কর সহ পুরো দলকে ধরে কঠিনতম শাস্তি দেবেন, অথবা নিজেকেই নিজে গুলি করে মারবেন, দেখা যাক কে জেতে আজ, অকাল্ট না হিউম্যানিটি অ্যান্ড জাস্টিস!

এমন সময় যেন করুণ নিয়তির মতই দিকবিদিক শিউড়ে দিয়ে ভেসে এলো সেই আর্তনাদ, "বাপু, কোথায় তুমি? আমার খুব কষ্ট হচ্ছে"!

লাফিয়ে ওঠেন স্লীম্যান, একটা বাচ্চার গলা না? চাবুকের মতন আছড়ে দেন নির্দেশটা "কাম অ্যালং", তারপর ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়তে থাকেন তাঁবুর দিকে।

****
****

তাঁবুর মধ্যে ঢুকেই দুর্গাশঙ্করের চোখ পড়লো মাটিতে রাখা লাশেদের স্তুপ এবং সেই লাশেদের মাঝে শোয়ানো একটি আট- দশ বছরের মেয়ের মৃত শরীরের ওপর।

সেই নিষ্পাপ শিশু যেন ভয়ে, আতঙ্কে কাঠ হয়ে যাওয়া দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওপরের দিকে, অব্যক্ত আকুতিতে যেন কাকে খুঁজছে, শেষ আশ্রয় হিসেবে। গলায় তখনও খয়েরী কালো রঙের খুনি রুমালটি জড়িয়ে, যেন শেষ বিকেলে দেখা সেই শঙ্খচূড়টির মতন!

স্থির হয়ে বিস্ফারিত চোখে সেই শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন দুর্গাশঙ্কর, সারা শরীর কাঁপছে শুকনো বাঁশপাতার মতন, হাতে পায়ে বশ নেই, ঠোঁটের পাশ গডিয়ে নামছে সাদা ফেনার মতন কষ, থরহর কাঁপছে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক দুর্গাশঙ্করের সমস্ত দেহ, সমস্ত আত্মা, সমস্ত সত্ত্বা!

বাকি ঠগীরা স্তব্ধ হয়ে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখছিল তাদের নিষ্ঠুর নির্দয় ভয়ঙ্কর, কিন্তু এই মুহূর্তে বেপথু বেএক্তিয়ার অচেনা ঠাকুরকে। একটি শিশুর লাশ দেখে ঠাকুর অত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন কেন সেটা ওরা কেউই বুঝতে পারছিল না। ছুটনিয়া হাতজোড় করে নিবেদন করে "গুসসা না করে ঠাকুর, একে তো জিন্দা রাখতেই চেয়েছিলাম, ঝুরকো মাহাতোকে বেচলে ভালো দাম পাওয়া যেতো। তাই তাঁবুর বাইরেই বাবুনিয়া খেলা করছিল একে নিয়ে, কি যে হল, ঠিক ঝিরনী দেবার সময়েই দৌড়ে এসে ঢুকলো, তখন কি আর বাঁচিয়ে রাখা যায় ঠাকুর? আপনিই বলুন"

এসব কথার বিন্দুবিসর্গ দুর্গাশঙ্করের কানে ঢুকছিলো না, থরথর দেহে, বিস্ফারিত চোখে তিনি চেয়েছিলেন সেই শিশুটির আতঙ্কিত চোখদুটির দিকে, কুঁকড়ে যাওয়া আঙুলগুলির দিকে, যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাওয়া ঠোঁটদুটির দিকে...

তিরিশ বছর, তিরিশটা বছর অপেক্ষা করেছেন দুর্গাশঙ্কর। যে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটিকে ফের ফিরে পাওয়ার জন্যে জীবনের সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়েছেন, নরকের দরজায় নিজের আত্মাকে বলি দিয়েছেন নিজের হাতে, আজ সেই মেয়ে ফের একটি লাশ হয়ে শুয়ে আছে দুর্গাশঙ্করের সামনে। হুবহু সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কোঁকড়ানো চুল, সেই গোলমটোল শরীর। যাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে দুর্গাশঙ্কর স্বর্গসুখ পেতেন, যার অভিমানে ফোলান ঠোঁট দেখলে দুর্গাশঙ্করের বুকে শেল বিদ্ধ হতো, একটা পুঁতির হারছড়া হাতে পেলে যার মুখের হাসি দেখে দুর্গাশঙ্কর নিজেকে ধন্য মনে করতেন, যে মেয়ে তিরিশ বছর আগেকার এক সর্বনাশা আগুনে সন্ধ্যা দুর্গাশঙ্করের সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছিলো, ঠিক সেই মেয়েই যেন কোন এক অলঙ্ঘনীয় অলৌকিক শক্তির ইশারায় তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ ঠগী দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিতের তিরিশ বছরের সাধনাকে এক লহমায় মাটিতে মিশিয়ে দেবে বলে মাটিতে শুয়ে আছে!

"মুন্নিইইইইই, বেটি আমার, কোথায় গেলি তুই" বলে একটা আর্তনাদ করে সেই শিশুটির লাশের ওপর আছড়ে পড়লেন দুর্গাশঙ্কর!

হতভম্ব ঠগীদের দল বুঝতেও পারলো না যে তাদের ঘিরে ফেলেছে গোরা সিপাহিদের লালমুখো ফৌজ।

বুঝলেও অবশ্য কিছু করার ছিল না আর!

****
****

গভীর রাতে যখন কোমরে দড়ি পরা দুর্গাশঙ্করকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন স্লীম্যান, তখনও দুর্গাশঙ্কর প্রলাপ বকে চলেছেন। রক্তজবার মতন লাল চোখ, শনের মতন উস্কখুস্ক চুল উড়ছে হাওয়ায়। ইতিউতি চাইছেন, পাশে খোদাবক্সকে দেখেও চিনতে পারলেন না, মুখে শুধু " মুন্নি, মুন্নি মা আমার " গোঙানি। থেকে থেকেই হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছেন, ফিরিঙ্গিয়া আর খোদাবক্স ধরে তুলে দিচ্ছে সেই অবশ থরোথরো দেহ, ফের টানতে শুরু করছেন স্লীম্যান।

ব্রিটিশ আর দেশী সিপাইরা বাকি ঠগীদের মহড়া নিচ্ছে এখন। অবশ্য হতবাক সেই খুনীগুলোকে কব্জা করতে শিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর বেশী দেরি হবার কথাও নয়। এখন স্লীম্যানের দরকার খোদাবক্সের দেখে যাওয়া কুঁয়োটা, যাতে এভিডেন্স সহ ওয়াটারটাইট কেস খাড়া করতে পারেন এই ডেমোনিক পণ্ডিতটির ওপর!

একে যায়গাটা বেশী দূর নয়, তার ওপর শুক্লপক্ষ চতুর্দশী, খুব দ্রুতই সেই প্রাচীন কুঁয়োটির কাছে পৌঁছে গেলো এই ছোট দঙ্গলটি। তার ক্ষণিক পরেই খুব দ্রুত সেই কুঁয়োর ওপরের ডালপালা সরিয়ে সেই প্রাচীন গহবরটির মুখ উন্মোচন করে খোদাবক্স আর ফিরিঙ্গিয়া।

ফের সেই বিষণ্ণ কটু মড়াপচা গন্ধ ধাক্কা মারে সবার নাকে, নাকে হাত চাপা দেয় তিনজন, দুর্গাশঙ্কর ক্রমাগত বকতে থাকেন। কি মনে হতে বাঁহাতে নাক চাপা দিয়ে ডানহাত দিয়ে দুর্গাশঙ্করের হাত চেপে ধরেন স্লীম্যান, সঙ্গে সঙ্গে শিউড়ে উঠে হাত ছেড়ে দেন...

উত্তপ্ত জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে দুর্গাশঙ্করের গা, দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে যেন, ছোঁয়া অবধি যায় না!

ততক্ষণে একটা মশাল জ্বালিয়ে ফেলেছে ফিরিঙ্গিয়া, সেইটা হাতে নিয়ে কুঁয়োর ওপরে তুলে ধরেন স্লীম্যান, পেছন থেকে উঁকি দেয় খোদাবক্স আর ফিরিঙ্গিয়া,

এবং তিনজনেই শিউড়ে ওঠেন!!

নিচে গাদাগাদি করে পড়ে আছে একগাদা লাশ।

বেশীরভাগই কঙ্কাল, সাদা হাড়গুলো হা হা করে হাসছে যেন। কিছু লাশ আধপচা, মাংস গলে খসে পড়ছে, চোখের গর্ত থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে মাংসখেকো পোকার দল। একটি দুটি লাশ দেখলে বোঝা যায় যে তখনও পচন ধরে নি, সদ্য এখানে ফেলা হয়েছে।

একরাশ ঘৃণা আর বিস্ময় মিশিয়ে সেই অপ্রকৃতিস্থ ব্রাহ্মণের দিকে ফিরলেন স্লীম্যান, "এইসব তোমার কাজ পণ্ডিত? এদের নিয়ে তুমি ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছো?"

জবাফুলের মতন লাল টকটকে চোখ মেলে চাইলেন দুর্গাশঙ্কর, সম্পূর্ণ ফাঁকা ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে আশেপাশে কি যেন দেখলেন, তারপর ফিসফিস করে বললেন "ওরা আমাকে ডাকছে"।

কথাটা ভালো করে শুনতে পাননি স্লীম্যান, তাই ফের জিজ্ঞেস করেন "কে ডাকছে পণ্ডিত? "

"ওরা আমাকে ডাকছে, তোমরা কেউ শুনতে পাচ্ছ না? ওরা সবাই মিলে আমাকে ডাকছে যে। পাতাল থেকে ওরা উঠে আসতে চাইছে, শুনতে পাচ্ছ নে তোমরা? ডাকছে আমাকে, আমাকে যেতে হবে, ডাকছে ওরা, আমাকে যেতে হবে, যেতে হবে" বলতে বলতে দৌড়ে গিয়ে সেই কুঁয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন দুর্গাশঙ্কর পণ্ডিত!

দ্রুত হতভম্ব ভাব কাটিয়ে মশাল নিয়ে সেই কুঁয়োর মধ্যে উঁকি দিলেন তিনজনে, চেঁচিয়ে উঠলেন স্লীম্যান "মাই গুডনেস, এই পাগল লোকটাকে তুলতে হবে এক্ষুণি। খোদাবক্স, ফিরিঙ্গিয়া জলদি চলো, লম্বা দড়ি লাগবে আর আরও কিছু লোক, কাম ক্যুইক"।

মশাল হাতে জঙ্গলের বাইরের দিকে দৌড়তে লাগলেন তিনজন।

****
****

লোকলশকর নিয়ে যখন ফিরে এলেন স্লীম্যান, তখন রাত্রির তৃতীয় প্রহর। মরা চাঁদের মৃত্যুশীতল জোৎস্নার বিষণ্ণ হিম ছড়িয়ে আছে বিশ্বচরাচরে। সেই চোরা আলোআঁধারিতে, আধোচেনা সুঁড়িপথ বেয়ে মশালের আলো আর ধোঁয়ায় সদলবলে এসে পৌঁছলেন স্লীম্যান, তখনও অপার্থিব আশঙ্কায় মূক চারিদিক। একটি পাতাও নড়ছে না, জঙ্গল যেন ভুলে গেছে নিঃশ্বাস নিতেও, আর কোন শব্দ নেই, কোন প্রাণের চিহ্ন নেই, শুধু সেই ম্লান রক্তজোৎস্নায় ধুয়ে আছে এই বনভূমি।

কুঁয়োটির এককোণে জড়ো হয় ক্ষুদ্র দলটি। মশাল নিয়ে একজন দেশী সিপাই প্রথমে সেই কুঁয়োর মুখে যায়, ধীরে ধীরে উঁচু করে তুলে ধরে সেই আলো, এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ আর্তনাদ করে মূর্ছা যায় সে, ভূলুণ্ঠিত মশাল নিভে যায় দ্রুত।